বেহেশতের সুসংবাদ পেলেন যাঁরা

নাসির হেলাল

বেহেশ্‌তের সুসংবাদ পেলেন যাঁরা

নাসির হেলাল

সুহৃদ প্রকাশন
বুকস এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.icsbook.info

বেহেশতের সুসংবাদ পেলেন যাঁরা
নাসির হেলাল

প্রকাশক
উম্মে ফারহানা খুশী
সুহৃদ প্রকাশন
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১২ ১৫৩৩৬২

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৫
৯ম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১২
প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম
মুদ্রণ : আল-আকাবা প্রিন্টার্স

মূল্য : আশি টাকা
ISBN : 984-632-002-7

Beshester Susangbad Pelen Jara by Nasir Helal
Published by Sureed Prokason
38/3 Banglabazar, Dhaka-1100
Price : Taka 80.00 **Only**

www.icsbook.info

উৎসর্গ

ঐ সকল কিশোর তরুণদের হাতে যারা
ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে
সদা তৎপর।

www.icsbook.info

লেখকের অন্যান্য কয়েকটি জীবনীগ্রন্থ

- নবী রাসূলের জীবনকথা (১ম খণ্ড)
- ফুলের মত নবী
- বিশ্বনবীর পরিবার বা আহলে বাইত
- মু'মীনদের মা
- নবী দুলালী
- মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা
- মুনসী মেহেরউল্লা: জীবন ও কর্ম
- জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা
- মুসলিম মনীষীদের জীবন কথা (১ম খণ্ড)
- ছোটদের চার খলিফা
- ছোটদের হযরত আদম (আ.)
- ছোটদের হযরত ফাতিমা (রা.)
- ছোটদের হযরত খাদিজা (রা.) ও আয়শা (রা.)

www.icsbook.info

ভূমিকা

ইসলামের প্রথম যুগে যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন। যাঁরা মহানবী (সা.) এর সার্বক্ষণিক সাহচর্যে এসেছিলেন, তাঁরা মানবশ্রেষ্ঠ ঐ মানুষটার ছোঁয়ায় এসে নিজেরাও হয়েছিলেন সোনার মানুষ। তাইতো তাঁদের জীবদ্দশাতেই রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে তাদেরকে বেহেশতী বলে ঘোষণা করা হয়। ইসলামী পরিভাষায় সুসংবাদ প্রাপ্ত এ সমস্ত সম্মানিত সাহাবাদেরকে আশারায়ে মোবাশ্‌শারা বলা হয়েছে। 'বেহেশতের সুসংবাদ পেলেন যাঁরা' গ্রন্থটি ঐ দশজন সাহাবীর সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ জীবনী।

ছোটদের জন্য বাংলা ভাষায় নবী, রাসূল, সাহাবী, মুসলিম মনীষীদের জীবনী তেমন একটা লেখা হয়নি। এদিকটা সামনে রেখেই চিন্তাশীল শিশু-কিশোরদের জন্য আমার বিনীত প্রয়াস। যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণা ধর্মীতা বজায় রেখে লেখার, আবার এদিকেও খেয়াল রাখা হয়েছে যাতে কিশোর–কিশোরীদের বুঝতে কোন অসুবিধা না হয়।

যদিও লেখাগুলো শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্যে রচিত তবুও আমার বিশ্বাস বড়দের কাছেও ভাল লাগবে। লেখা দশটি ধারাবাহিকভাবে দৈনিক সংগ্রামের শিশুদের পাতা 'শাহীন শিবিরে' যখন ছাপা হচ্ছিলো তখন অনেকেই আমাকে এটা বই আকারে প্রকাশের জন্য তাকিদ দিচ্ছিলেন। কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক কারণে ছাপা সম্ভব হয়নি। শেষমেষ আল ফালাহ পাবলিকেশন্স গ্রন্থটির ১ম, ২য় ও ৩য় প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থের লেখা দশটি আগ্রহের সাথে 'শাহীন শিবিরে' ছাপার জন্য শাহীন শিবিরের তৎকালীন পরিচালক জয়নুল আবেদীন আজাদ ও অত্যন্ত মমত্বের সাথে প্রচ্ছদ অংকন করে দেওয়ার জন্য শিল্পী হামিদুল ইসলামকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

গ্রন্থটির ৪র্থ প্রকাশ থেকে পরবর্তী প্রকাশের দায়িত্ব বহন করবে 'সুহৃদ প্রকাশন'।

গ্রন্থপাঠে যদি কোন শিশু-কিশোর অথবা কোন পাঠকের জানার আগ্রহ তীব্র হয় তো নিজেকে সার্থক মনে করব।

নাসির হেলাল

www.icsbook.info

শিরোনাম

১. হযরত আবূ বকর ইবন কুহাফা (রা.)
২. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)
৩. হযরত ওসমান ইবন আফ্‌ফান (রা.)
৪. হযরত আলী ইবন আবূ তালীব (রা.)
৫. হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.)
৬. হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াকক্‌াস (রা.)
৭. হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা.)
৮. হযরত তালহা ইবন ওবায়দুল্লাহ (রা.)
৯. হযরত আবূ ওবাইদাহ্‌ ইবনুল জাররাহ (রা.)
১০. হযরত সাঈদ ইবন যায়িদ (রা.)

www.icsbook.info

হযরত আবূ বকর ইবন কুহাফা (রা.)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সমগ্র এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এলো। সাহাবা মণ্ডলী হতবাক হয়ে গেলেন, তাঁরা ধারণাই করতে পারছিলেন না যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আর এ দুনিয়ায় নেই। এমনকি হযরত ওমর (রা.) পর্যন্ত তরবারি কোষমুক্ত করে ঘোষণা দিলেন, 'যে বলবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত হয়েছে তাকে হত্যা করবো।' সবারই যখন অবস্থা এই তখন একজন মানুষই ছিলেন ধীর স্থির এবং অবিচল। তিনি হলেন রাসূল (সা.)-এর প্রিয় বন্ধু, নিত্যদিনের সহচর হযরত আবূ বকর (রা.)। হযরত ওমর (রা.)-এর ঘোষণা শুনে আবূ বকর (রা.) এগিয়ে এলেন এবং ঘোষণা দিলেন, 'যারা মুহাম্মদের ইবাদত করতো তারা জেনে রাখো, মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদত করো তারা জেনে রাখো আল্লাহ চিরঞ্জীব-তাঁর মৃত্যু নেই।' এরপর তিনি পবিত্র কালামে পাকের এ আয়াত পাঠ করে শুনালেন, 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন তাহলে তোমরা কি পেছনে ফিরে যাবে? যারা পেছনে ফিরে যাবে তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, শিগগির আল্লাহ তাদের প্রতিদান দেবেন' (আলে ইমরান-১৪৪ আ.)। হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মুখ থেকে এ আয়াতে কারিমা শুনার সাথে সাথে সবাই থমকে গেলেন। হযরত

www.icsbook.info

ওমর (রা.) সহ সকল সাহাবা সম্বিত ফিরে পেলেন। বুঝতেই পারছো হযরত আবূ বকর কোন প্রকৃতিরও কোন পর্যায়ের মানুষ ছিলেন। এখন আমরা তাঁর বিষয়েই জানার চেষ্টা করবো। যিনি আশারায়ে মোবাশ্‌শারার বা বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রধান।

তোমরা অনেকেই হয়ত হযরত আবূ বকর (রা.)-এর আসল নাম জানোনা। তাঁর আসল নাম ছিলো আবদুল্লাহ। আর আবূ বকর হলো ডাক নাম। পরবর্তীকালে তিনি দু'টি সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত হন- সিদ্দীক ও আতীক। তাঁর আব্বার আসল নাম ছিল উসমান এবং ডাক নাম ছিল আবূ কুহাফা। তাঁর মাতার নাম ছিলো সালমা এবং ডাক নাম ছিলো উম্মুল খায়ের। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে, তাঁরা সবাই ডাক নামেই বহুল পরিচিত হয়ে আছেন। ধরো হযরত আবূ বকরের কথা- তাঁর আসল নাম যে আবদুল্লাহ তা আমরা কয় জনই বা জানি? তিনি রাসূলুল্লাহর (সা.) থেকে দু'বছরের ছোট ছিলেন অর্থাৎ তাঁর জন্ম সাল ৫৭২ খৃষ্টাব্দ।

তোমরা সকলেই জানো যে হযরত আবূ বকরই পুরুষদের মধ্যে প্রথম মুসলমান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনিই খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম খলিফা। তিনিই সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি। অর্থাৎ তিনিই সব ক্ষেত্রে প্রথম এবং প্রধান।

হযরত আবূ বকরের ইসলাম গ্রহণের সাথে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িয়ে আছে। তিনি মুহাম্মদ (সা.) আবাল্য সংগী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যতগুলো বাণিজ্য সফরে গেছেন তার বেশীর ভাগ সফরে আবূ বকরও (রা.) সাথী ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর বয়স যখন ২০ বছর আর আবূ বকর (রা.)-এর ১৮ বছর তখন তাঁরা সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরে যান। এই সফরকালে সিরিয়া সীমান্তে উপনীত হলে রাসূল (সা.) একটি গাছের নীচে বিশ্রামের জন্য বসেন। সে সময়ে আবূ বকর (রা.) এলাকাটা দেখার জন্য এদিক ওদিক হাটাহাটি করতে

www.icsbook.info

থাকেন। এরই এক পর্যায়ে এক খৃষ্টান পাদ্রীর সাথে সাক্ষাৎ হয় তাঁর এবং ধর্মীয় কিছু আলাপ আলোচনা হয়। আলোচনা কালে পাদ্রী জানতে চান তার সঙ্গী যুবকটি কে। আবূ বকর (রা.) যুবক মুহাম্মদের (সা.) পরিচয় দিলে পাদ্রী স্বগত বলে ওঠেন 'এ ব্যক্তি আরবদের নবী হবেন।' সেই যে কথাটি আবূ বকর তাঁর অন্তরে গেঁথে নিলেন আর ভুলেননি। ফলে রাসূল (সা.)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির সাথে সাথে বিনা বাক্য ব্যয়ে তিনি ইসলাম কবূল করলেন। অবশ্য হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূল (সা.)-এর সব কথা বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করেছেন। এ জন্যই রাসূল (সা.) তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, একমাত্র আবূ বকর ছাড়া প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করেছি।'

ধরা যাক মি'রাজের ঘটনা-সেখানেও তো আবূ বকর (রা.) এক অবিশ্বাস্য নজীর স্থাপন করেছেন। যখন অবিশ্বাসীরা তো বটেই এমন কি সাহাবীরা পর্যন্ত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোল খাচ্ছিলেন, পরবর্তীতে অনেক দুর্বল ঈমানের মুসলমানরা ইসলাম ত্যাগ করেছিল-সেই অবস্থায়ও আবূবকর দ্বিধাহীন চিত্তে রাসূল (সা.)-এর মি'রাজ কে সত্য বলে বিশ্বাস করেন। তোমাদেরকে বলে এখন ঠিক বুঝানো যাবে না যে, তখন অবস্থাটা কেমন ছিলো। একটু খুলে বলি-মি'রাজের কথা যখন রাসূল (সা.) সবাইকে বললেন তখন, একটা হৈ হৈ পড়ে গেলো। একদল লোক এসে আবূ বকর (রা.) কে বললেন, 'আবূ বকর তোমার বন্ধুকে তুমি বিশ্বাস করো? তিনি বলছেন, তিনি নাকি গত রাতে বাইতুল মাকদাসে গেছেন, সেখানে তিনি নামায পড়েছেন, অতঃপর মক্কায় ফিরে এসেছেন।'

উত্তরে আবূ বকর বললেন, 'আল্লাহর কসম, তিনি যদি এ কথা বলে থাকেন তাহলে সত্য কথাই বলেছেন। এতে অবাক হওয়ার কি দেখলে? তিনি তো আমাকে বলে থাকেন, তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ

www.icsbook.info

থেকে ওহী আসে। আকাশ থেকে ওহী আসে মাত্র এক মুহূর্তের মধ্যে। তাঁর সে কথাও আমি বিশ্বাস করি। তোমরা যে ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করছো এটা তার চেয়েও বিস্ময়কর।' এরপর তিনি সবাইকে নিয়ে রাসূল (সা.)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনি কি গতরাতে বাইতুল মাকদাসে ভ্রমণ করেছেন, এ কথা বলেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। একথা আমি বলছি।' সংগে সংগে আবূ বকর (রা.) বললেন 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল।' নবী (সা.) বললেন, 'হে আবূ বকর, তুমি সিদ্দীক।' সেই থেকেই তিনি আবূ বকর সিদ্দীক নামে পরিচিত হলেন।

সাহাবীদের মধ্যে দানশীলতার ক্ষেত্রে হযরত আবূ বকরই (রা.) ছিলেন সবার আগে। তিনি যখন ইসলাম কবূল করেন তখন তাঁর হাতে চল্লিশ হাজার দিরহাম মওজুত ছিলো। একবার ভেবে দেখো আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে চল্লিশ হাজার দিরহাম মানে এখনকার কতো টাকা। হযরত আবূ বকর আরবের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁর পিতা আবূ কুহাফাও ছিলেন প্রভূত সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি। এই ধনী পিতার ধনী সন্তান ইসলাম কবূলের পর তার সমস্ত অর্থ সম্পদ, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন। তিনি তাঁর গচ্ছিত নগদ অর্থ দিয়ে কুরায়শদের হাতে নির্যাতিত লাঞ্ছিত দাস-দাসীদের মুক্ত করেন। তার অর্থেই-বিলাল, আম্মার, খাব্বাব, সুহাইব প্রমুখ মুক্ত জীবনে ফিরে আসতে সক্ষম হন।

তিনি দানশীলতার ক্ষেত্রে এতো অধিক অগ্রসর ছিলেন যে, তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূল (সা.)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধের খরচের জন্য তাঁর বাড়িতে যা কিছু ছিলো নিয়ে আসেন। রাসূল (সা.) অবস্থা বুঝে জিজ্ঞেস করেন, 'বাড়িতে ছেলে মেয়েদের জন্য কিছু রেখে এসেছো কি? জবাবে আবূ বকর (রা.) বললেন, 'আল্লাহ ও আল্লাহর

www.icsbook.info

রাসূলই তাদের জন্য যথেষ্ঠ।' এ জন্যই পরবর্তীকালে রাসূল (সা.) তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমি প্রতিটি মানুষের ইহসান পরিশোধ করেছি। কিন্তু আবূ বকরের ইহসান এমন যে, তা পরিশোধ করতে আমি অক্ষম। তার প্রতিদান আল্লাহ দেবেন। তার অর্থ আমার উপকারে যেমন এসেছে, অন্য কারো অর্থ তেমন আসেনি।'

অপরের কাজ নিজ হাতে করে দেবার ক্ষেত্রেও আবূ বকর (রা.) ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। হযরত আবূ বকরের খেলাফতকালে হযরত ওমর (রা.) এক বৃদ্ধার কাজ করে দিতেন। কিন্তু একদিন কাজ করতে গিয়ে শুনলেন এক নেক্কার ব্যক্তি আগেই কাজগুলো করে গেছেন। ওমর (রা.) অনেক চিন্তা করেও বের করতে পারলেন না কে এই ব্যক্তি। এরপর কয়েকদিন তিনি অতি ভোরে এসে দেখলেন পূর্বেই কাজগুলো সেই ব্যক্তি করে গেছেন। পরে তিনি জানলেন সেই ব্যক্তি আর কেউ নন, মুসলিম দুনিয়ার খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কিশোর বয়স থেকে শুরু করে ওফাতের আগ পর্যন্ত যিনি সার্বক্ষণিক সহচর ছিলেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটির নামও আবূ বকর ইবনে কুহাফা (রা.)। আমি আগেই তোমাদের বলেছি রাসূলের নবুওয়ত প্রাপ্তির পরে তো কথায় নেই। তোমরা সকলেই হয়তো জানো যে হিযরতের সময় রাসূল (সা.)-এর সংগী ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। আর এ জন্য তিনি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। ঘটনাটি এমন হযরত মুহাম্মদ (সা.) আবূ বকর (রা.) বাড়িতে এসে বললেন, 'আল্লাহ আমাকে হিযরত করার অনুমতি দিয়েছেন।' আবূ বকর জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি আপনার সংগী হতে পারবো।' রাসূল (সা.) বললেন, 'হা, পারবে।' রাসূল (সা.)- এর হা বোধক জবাবে আবূ বকর (রা.) আনন্দে কেঁদে ফেললেন। এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ! এই দেখুন, আমি এই উট দুটো এই

www.icsbook.info

কাজের জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছি।'

মক্কা বিজয়ের পর প্রথম যে হজ্জ উদযাপন করা হয় তাতে আবূ বকর (রা.) কে রাসূল (সা.) 'আমীরুল হজ্জ' নিযুক্ত করেন। হিজরাতের পর তিনি সকল অভিযানেই অংশগ্রহণ করেন এবং তাবুক অভিযানে তিনি মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন।

রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর সর্ব সম্মতিক্রমে আবূ বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন। অবশ্য এর আগে, রাসূল (সা.) যখন রোগ শয্যায় ছিলেন তখন রাসূলেরই নির্দেশে মসজিদে নব্বীর নামাযের ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন তা চিরকাল শাসকদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, 'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি চাচ্ছিলাম, আপনাদের মধ্য থেকে অন্য কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনারা যদি চান আমার আচরণ রাসূলুল্লাহর (সা.) আচরণের মত হোক, তাহলে আমাকে সেই পর্যায়ে পৌছার ব্যাপারে অক্ষম মনে করবেন। তিনি ছিলেন নবী । ভুলত্রুটি থেকে তিনি পবিত্র। তাঁর মতো আমার কোন বিশেষ মর্যাদা নেই। আমি একজন সাধারণ মানুষ। আপনাদের কোন একজন সাধারণ ব্যক্তি থেকেও উত্তম হওয়ার দাবী আমি করতে পারিনে।..... আপনারা যদি দেখেন আমি সঠিক কাজ করছি, আমার সহায়তা করবেন। যদি দেখেন আমি বিপদগামী হচ্ছি, আমাকে সতর্ক করে দেবেন।'

সত্যি তিনি ছিলেন এক মহান খলীফা 'কথা ও কাজের মধ্যে তাঁর কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি নিজেকে খলীফা না মনে করে মনে করতেন জনগণের সেবক। আবার তিনি ইসলামী হুকুম আহকাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। আবাস ও জুবইয়ান

www.icsbook.info

গোত্রদ্বয় যাকাত দিতে অস্বীকার করলে, তিনি ঘোষণা দিলেন, 'আল্লাহর কসম, রাসূলের (সা.) যুগে উটের যে বাচ্চাটি যাকাত পাঠানো হতো এখন যদি কেউ তা দিতে অস্বীকার করে আমি–তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।' এই খলীফাতুল মুসলেমীনের খলীফা হিসাবে উপাধি ছিল-খলীফাতু রাসূলুল্লাহ। আর অন্য তিনজনের উপাধি ছিল আমীরুল মু'মেনীন।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, হযরত আবূ বকর (রা.)–এর চরিত্র ছিলো কঠিন ও কোমলের সমন্বয়ে গঠিত। তাঁর জীবনে এমন এমন ঘটনা আছে যা আমাদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়। তোমরা বড় হলে তাঁর সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু জানতে পারবে।

আবূ বকর (রা.) ৭ই জমাদিউল আওয়াল, ১৩ হিজরীতে জ্বরে পড়েন এবং ১৫ দিন রোগ ভোগের পর ২১শে জমাদিউল আউয়াল, ইংরেজী ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জান্নাতবাসী হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর। তিন মাস দশ দিন খিলাফতের পদে আসীন ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর পূব পাশের তাঁর আবাল্য সহচর প্রিয় বন্ধু আবূ বকর (রা.) কে দাফন করা হয়।

www.icsbook.info

আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর (রা.)

মুক্ত তরবারি হাতে ছুটে ছলেছেন এক যুবক। মুরুভূমির রুক্ষতা তার চোখে মুখে। দেখলেই বোঝা যায় তিনি কাউকে খতম করতেই ছুটছেন। যুবকের নাম ওমর। হাদীসে আনাস ইবন মালিক থেকে ঘটনাটি এ ভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে ওমর চলেছেন। পথে বনি যুহরার এক ব্যক্তির (মতান্তরে নাঈম ইবন আবদুল্লাহ) সাথে দেখা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন দিকে ওমর?'

ওমর বললেন, 'মুহাম্মদের একটা দফারফা করতে।'

লোকটি বললেন, 'মুহাম্মদের (সা.) দফারফা করে বনি হাশিম ও বনি যাহরার হাত থেকে বাঁচবে কিভাবে?'

একথা শুনে ওমর বলে উঠলেন, 'মনে হচ্ছে তুমিও পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়েছো?'

লোকটি বললেন, 'ওমর, একটি বিস্ময়কর খবর শোনো, তোমার বোন-ভগ্নিপতি বিধর্মী হয়ে গেছে। তারা তোমার ধর্ম ত্যাগ করেছে।'

একথা শুনে রাগে উন্মত্ত হয়ে ওমর ছুটলেন তাঁর বোন ভগ্নিপতির বাড়ির দিকে। বাড়ির দরজায় ওমরের করাঘাত পড়লো। তাঁরা দু'জন তখন খাব্বাব ইবন আল-আরাত-এর কাছে কোরআন শিখছিলেন। ওমর আসার আভাস পেয়ে খাব্বাব বাড়ির অন্য একটি ঘরে আত্মগোপন করলেন।

ওমর বোন-ভগ্নিপতিকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন,'তোমাদের এখানে গুন্‌গুন্ আওয়াজ শুনছিলাম, তা কিসের?'

www.icsbook.info

তাঁরা তখন কোরআনের সূরা ত্বাহা পাঠ করছিলেন।

তাঁরা উত্তর দিলেন, 'আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলাম।'

ওমর বললেন, 'সম্ভবত তোমরা দু'জন ধর্মত্যাগী হয়েছো।

ভগ্নিপতি বললেন, 'তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য কোথাও যদি সত্য থাকে তুমি কি করবে ওমর?'

একথা শুনে ওমর তাঁর ভগ্নিপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দু'পায়ে ভীষণ ভাবে তাঁকে মাড়াতে লাগলেন। বোন তাঁর স্বামীকে বাঁচাতে এলে ওমর তাঁকে এমন মার দিলেন যে, তাঁর মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেলো।

বোন রাগে উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'সত্য যদি তোমার দ্বীনের বাইরে অন্য কোথাও তাকে তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ।'

আসল নাম 'ওমর, ডাক নাম আবূ হাফ্স। পরবর্তীকালে উপাধি পান ফারুক। তাঁর আব্বার নাম খাত্তাব এবং মায়ের নাম হান্তামা। আব্বা আম্মা উভয়েই কুরাইশ বংশের লোক। আরো একটু খোলোসা করে বলি– হযরত ওমরের আম্মা কুরাইশ বংশের সেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হিশাম ইবনে মুগীরার কন্যা। মানে হিশাম ইবনে মুগীরা ওমর (রা.)-এর নানা আর তিনি হলেন দৌহিত্র। তোমরা শুনলে আরো আশ্চর্য হবে যে, ইসলামের অন্যতম প্রধান সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ হিশাম ইবন মুগীরারই পৌত্র অর্থাৎ কিনা ওমরের আপন মামাতো ভাই। অপরদিকে ওমরের আপন চাচাতো ভাই হলেন যায়িদ বিন নুফাইল । যিনি সৌভাগ্য ক্রমে রাসূল (সা.)- এর আবির্ভাবের পূর্বেই নিজের বিচার বুদ্ধি গুণে মুর্তিপূজা ত্যাগ করেন এবং তাওহীদবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হন।

হযরত ওমররের (রা.) বাল্য ও কৈশর সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা

www.icsbook.info

যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি মক্কার নিকটবর্তী 'দাজনান' নামক স্থানে তাঁর পিতার উট চরাতেন। অর্থাৎ রাখালের কাজ করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'এমন এক সময় ছিল যখন আমি পশমী জামা পরে এই মাঠে প্রখর রোদে খাত্তাবের উট চরাতাম। খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও নীরস ব্যক্তি। ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিলে পিতার হাতে নির্মম ভাবে মার খেতাম। কিন্তু আজ আমার এমন দিন এসেছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আমার ওপর কর্তৃত্ব করার আর কেউ নেই।'

ওমর আরবের একজন শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে সুনাম কুড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। আরবের প্রথা অনুযায়ী তিনি নসব নামা বা বংশ তালিকা বিদ্যাও আয়ত্ব করেন। আর যুদ্ধ বিদ্যায় ছিলেন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। অপর দিকে জাহিলী আরবের তিনি ছিলেন, এক বিখ্যাত ঘোড় সওয়ার। এ ব্যাপারে আল্লামা জাহিয বলেছেন, 'ওমর ঘোড়ায় চড়লে মনে হতো ঘোড়ার চামড়ার সাথে তাঁর শরীর মিশে গেছে।' হযরত ওমরের ছিল অসাধারণ মনে রাখার ক্ষমতা। তৎকালীন সময়ের খ্যাতনামা সব কবিদের সব কবিতায় তার কণ্ঠস্থ ছিলো বলে জানা যায়। এ থেকে প্রমাণ হয় তিনি কতবড় কাব্য প্রেমিক ছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি একজন শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। জানা যায়, রাসূলে করীমের (সা.) নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় গোটা কুরাইশ বংশে মাত্র, সতেরো জন লেখা পড়া জানতেন। তাদের মধ্যে ওমর একজন।

হযরত ওমরের (রা.) ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ছিল আকস্মিক ও অত্যন্ত হৃদয় গ্রাহী। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তোমাদেরকে জানানোর জন্যই প্রথমেই ইসলাম ও মুহাম্মদের বিরুদ্ধে ওমরের যে অভিযান ছিলো তা পেশ করেছি।

আসলে ওমর প্রকৃতিগত দিক থেকেই ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির মানুষ। এজন্য তিনি যখন জানতে পারলেন বোন ফাতিমা,

www.icsbook.info

ভগ্নিপতি এবং চাচাতো ভাই যায়িদ, দাসী লাবীনা এমন কি তার বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তি নাঈম ইবন আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তখন তিনি স্বাভাবিক ভাবেই মাথা ঠিক রাখতে পারেননি। বোন ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের সংবাদে তাই ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদেরকে মারাত্মকভাবে আহত করতেও তার বাঁধেনি। কিন্তু আপন সহোদরার সমস্ত শরীর এবং মুখ যখন রক্তাক্ত দেখেছেন তখন আর নিজেকে জাহেলিয়াতের ওপর মজবুত রাখতে পারেননি। মুহূর্তের মধ্যে মন থেকে শিরকের সমস্ত কালিমা উবে গেলে তিনি সত্যের বর্ণালী আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। সংগে সংগে সহোদরা ফাতিমার নিকট থেকে সূরা 'তাহা'র লিখিত অংশটুকু নিয়ে পড়লেন, আর স্বগত বলে উঠলেন, 'তোমরা আমাকে মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে নিয়ে চলো।' তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছি ওমরের আগমনে খাব্বাব আত্মগোপন করেছিলেন। ওমরের এহেন ঘোষণায় হযরত খাব্বাব (রা.) গোপন স্থান থেকে বের হয়ে এলেন। তিনি বললেন, 'সুসংবাদ ওমর! বৃহস্পতিবার রাতে রাসূল (সা.) তোমার জন্য দু'আ করেছিলেন। আমি আশা করি তা কবূল হয়েছে। তিনি বলেছিলেন,'আল্লাহ, ওমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর ইবন হিশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করো।'

হযরত খাব্বাবের (রা.) নিকট থেকে ওমর জানলেন রাসূল (সা.) এখন সাফার পাদদেশে দারুল আরকামে অবস্থান করছেন। অতএব আর ক্ষণকাল দেরী নয়, ওমর ছুটলেন, দারুল আরকামের দিকে।

দারুল আরকামে পাহারারত সাহাবীরা ওমর কে উন্মুক্ত তরবারী হাতে ছুটে আসতে দেখে ভয় পেলেন। হযরত হামযা (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সবাইকে অভয় দিয়ে বললেন, ওমর কল্যাণ চাইলে সে ইসলাম গ্রহণ করবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য কঠিন হবে না।

www.icsbook.info

এসময় রাসূল (সা.) ভেতরে ছিলেন। তিনি বের হয়ে ওমরের কাছে এসে বললেন, 'ওমর তুমি কি বিরত হবে না? তারপর দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! ওমর আমার সামনে, হে আল্লাহ, ওমরের দ্বারা দ্বীনকে শক্তিশালী করো।'

ওমর বলে উঠলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল।' এরপর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, ঘর থেকে বের হয়ে পড়ুন।'

হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ এতো বড় ঘটনা ছিলো যে, তাঁর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে হযরত জিবরাইল (আ.) নাযিল হয়ে বললেন, 'মুহাম্মদ (সা.), ওমরের ইসলাম গ্রহণে আসমানের অধিবাসীরা উৎফুল্ল হয়েছেন।' আর ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীরা তো খুশীতে ফেটে পড়লেন। কারণ তারা জানতেন, ওমরের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে ইসলামের ইতিহাস ভিন্ন দিকে মোড় নিলো। সত্যিই তাই–ওমর ইসলাম গ্রহণের পর পরই অন্য মুসলমানদেরকে নিয়ে কাবায় গিয়ে সালাত আদায় করলেন-যা ছিলো মুসলমানদের জন্য অভাবনীয় এবং বিস্ময়কর। কারণ ইতোপূর্বে ৪০/৫০ জন ইসলাম কবূল করলেও প্রকাশ্যে তাঁরা কাবাতে গিয়ে সালাত আদায় করার সাহস করেননি। ওমর এখানেই ক্ষ্যান্ত হলেন না। তিনি আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের প্রধান শত্রু আবূ জেহেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি তার দরজায় করাঘাত করলাম। আবূ জেহেল বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি মনে করে?' আমি বললাম, 'আপানকে একথা জানাতে এসেছি যে, 'আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর আনীত বিধান বাণীকে মেনে নিয়েছি।' একথা শোনা মাত্র সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলো এবং বললো, 'আল্লাহ তোকে কলংকিত করুক এবং যে খবর নিয়ে তুই এসেছিস তাকেও কলংকিত করুক।'

www.icsbook.info

বুঝতেই পরছো অবস্থা কি। মূলত এখান থেকেই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হয়। তারপর! তারপর তো কতো ঘটনা, কতো সংঘর্ষ-সংগ্রাম, কতো বিজয়। আর এ জন্যই আল্লাহর রাসূল (সা.) ওমর সম্পর্কে বলেছেন, 'ওমরের জিহবা ও অন্তঃকরণে আল্লাহ তা'আলা সত্যকে স্থায়ী করে দিয়েছেন। তাই সে 'ফারুক'। আল্লাহ তাঁর দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন।'

হযরত ওমর (রা.) সকল ক্ষেত্রেই প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। হিজরতকারী সকল সাহাবীই যেখানে নিরবে হিজরত করেছেন, এমন কি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে চুপে চুপে হিজরত করতে হয়েছে, সেখানে হযরত ওমর (রা.) প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে হিজরত করেছেন। ঘটনাটি এমন-তিনি প্রথমে কাবা তওয়াফ করে কুরাইশদের নিকট গিয়ে ঘোষণা দিলেন, 'আমি মদীনায় যাচ্ছি। কেউ যদি তার মাকে পুত্রশোক দিতে চায়, সে যেন এ উপত্যকার অপার প্রান্তে আমার মুখোমুখি হয়।

এই হচ্ছেন হযরত ওমর (রা.)। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূল (সা.) জীবিত থাকা পর্যন্ত রাসূল -এর জীবনে সংঘটিত প্রত্যেকটি ঘটনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি বদর থেকে শুরু করে ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত সকল যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেন। রাসূল (সা.) ওফাতের পরপরই খেলাফত সংক্রান্ত জটিলতার সময় তিনিই সবার আগে হযরত আবূ বকরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে-এ জটিল সমস্যার সহজ সমাধান করেন।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ইসলামের ইতিহাসে ইসলাম বিরোধী শাক্তির সাথে প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ হলো বদরের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সৈন্য পরিচালনা থেকে প্রায় সকল বিষয়েই ওমর (রা.) রাসূল (সা.) কে একজন প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তির মতো পরামর্শ দান করেন। এমন কি বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে তার পরামর্শই আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাতের পছন্দনীয়

www.icsbook.info

ছিলো। শুধু তাই নয়-এই যুদ্ধে তিনিই প্রথম শত্রু বাহিনীতে থাকার কারণে আপন মামা আ'মীর ইবনে হিশামকে নিজ হাতে হত্যা করেন। এর মাধ্যমে তিনি এ কথায় প্রমাণ করেন যে, সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরম আত্মীয়ও শত্রুতে পরিণত হতে পারে।

ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যখন পির্যয়ের সম্মুখীন, সবাই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছেন, কিছু সংখ্যক আহত সাহাবীসহ রাসূল (সা.) এক পাহাড়ী গুহায় নিরাপদ মনে করে আশ্রয় নিয়েছেন, তখন আবূ সুফিয়ান উচ্চস্বরে বলতে লাগলো, মুহাম্মদ তুমি ও তোমার সাথীরা কোথায়? কেউ কি বেঁচে আছো? রাসূলের (সা.) ইংগিতে কেহই সাড়া দিলেন না। উত্তর না পেয়ে আবূ সুফিয়ান স্বগোক্তি করলো, 'নিশ্চয় তারা সকলেই নিহত হয়েছে।'

এই উক্তি শোনার সাথে সাথে ওমর বলে উঠলেন, 'ওরে আল্লার দুশমন! আমরা সবাই জীবিত।'

আবূ সুফিয়ান বললো, 'উলু হুবল-হুবলের জয় হোক।'

ওমর জবাব দিলেন, 'আল্লাহু আ'লা ও আজাল্লু আল্লাহ-আল্লাহ মহান ও সম্মানী।'

দান দাক্ষিণ্যের ক্ষেত্রেও ওমর সম্মানিত হয়ে আছেন। মুসলমনারা যখন খাইবার জয় করলো, তখন খাইবারের বিজিত ভূমি মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করা হলো। হযরত ওমর তাঁর প্রাপ্য সমস্ত ভূমিই আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দিলেন। তোমরা শুনে খুশী হবে যে, ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম ওয়াক্‌ফ।

ওমর (রা.) মুহাম্মদ (সা.) কে এতো বেশী ভালোবাসতেন যে, তার ওফাতের সংবাদ শোনার সাথে সাথে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং তরবারি কোশমুক্ত করে বলে উঠলেন, 'যে ব্যক্তি বলবে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইনতিকাল করেছেন, আমি তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবো।'

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর ইবন কুহাফার (রা.)

www.icsbook.info

ইন্তেকালের আগেই হযরত ওমর সর্বসম্মতিক্রমে খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর শাসনকাল এখনো পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসাবে স্বীকৃত। 'দশ বছরের স্বল্প সময়ে গোটা বাইজান্টাইন, রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটান। তাঁর যুগে বিভিন্ন অঞ্চলসহ মোট ১০৩৬ টি শহর বিজিত হয়। ইসলামী হুকুমাতের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা মূলত তাঁর যুগেই হয়। সরকার বা রাষ্ট্রের সকল শাখা তাঁর যুগেই আত্ম প্রকাশ করে। তাঁর শাসন ও ইনসাফের কথা সারা বিশ্বে মানুষের কাছে কিংবদন্তীর মত ছড়িয়ে আছে।'

এই সেই শাসক যিনি তাঁর প্রজা সাধারণের অবস্থা দেখার জন্য অন্ধকার রাতে মহল্লায় মহল্লায় ছুটে বেড়াতেন। নিজে পিঠে করে খাদ্যের বস্তা অভূক্তদের বাড়িতে পৌছে দিতেন। দুধ বিক্রেতা সত্য বাদিনী যুবতীকে নিজের পুত্রবধূ হিসাবে বরণ করে নিয়েছেন। খৃষ্টান শাসকের আমন্ত্রণে জেরুযালেম যাওয়ার সময় উটের রাখালকে। পর্যায়ক্রমে উটের পিঠে উঠিয়ে নিজে রাখাল হিসাবে উটের রশি টেনে নিয়ে এগিয়ে গেছেন। অর্ধ দুনিয়ার বাদশাহ হয়েও নিজের রুটি রুজির জন্য ব্যবসাপাতি করেছেন।

আমিরুল মুমেনীন উপাধিতে ভূষিত প্রথম খলীফা হলেন হযরত ওমর (রা.)। আমরা এখন যে জামায়াতের সাথে তারাবীর নামায আদায় করি এটা তিনি প্রচলন করেন। হিজরী সন তাঁর আমল থেকেই গণনা শুরু হয়। তিনিই সেনাবাহিনীর ভেতর বিভিন্ন স্তরভেদ ও ব্যাটালিয়ন নির্দিষ্ট করেন। দেশের নাগরিক তালিকা তৈরী ও কারী নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলকে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য নানা প্রদেশে তিনিই বিভক্ত করেন।

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন অসম্ভব মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। রাসূল (সা.) নিজেই বলেছেন, 'লাও কানা বা'দী নাবিয়্যুন লা কানা ওমর', 'আমার পরে কোন নবী হলে ওমরই হতো।' কি বলো এর পর কি আর

www.icsbook.info

কোন কথা থাকে? আসলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ওমরের মর্যাদা ছিলো অতি উচ্চে। তোমরা শুনলে আনন্দিতই হবে যে, 'ওমরের সব মতের সমর্থনেই সর্বদা কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।

তার ব্যাপারে হযরত আলী (রা.) বলেছেন, 'নবীর (সা.) পর উম্মতের মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যক্তি আবূ বকর তারপর ওমর (রা.)।' আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'ওমরের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের বিজয়। তাঁর হিজরত আল্লাহর সাহায্য এবং তাঁর খিলাফত আল্লাহর রহমত।'

ইন্তেকালের পূর্বে ওমর (রা.) ছয়জন প্রখ্যাত সাহাবীর-হযরত আলী, উসমান, আবদুর রহমান, সা'দ, যুবাইর ও তালহার (রা.) ওপর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে যান। তাঁকে ৬৩ বছর বয়সে হিজরী ২৩ সনের ২৫ শে জিলহজ সোমবার আবূ লুলু ফিরোজ নামে মুগীরা ইবন শুবার (রা.) অগ্নি উপাসক দাস ফজরের নামাযরত অবস্থায় ছুরিকাঘাত করে। দশ বছর ছয় মাস চার দিন খিলাফতের দায়িত্ব পালনের পর মুসলিম দুনিয়ার আমিরুল মুমেনীন আহতাবস্থায় ৩ দিনের দিন বুধবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নামাযে জানাজার পর হযরত আবূ বকরের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জানা যায় ইমামতি করেন হযরত সুহায়িব (রা.)।

www.icsbook.info

হযরত ওসমান ইবন আফ্‌ফান (রা.)

ওসমান ইবন্ আফ্‌ফান (রা.) পরবর্তীকালে ইসলামের তৃতীয় খলীফা। মূল নাম ওসমান। ডাক নাম বেশ কয়েকটি - আবূ আবদুল্লাহ, আবূ লায়লা, আবূ আমর ইত্যাদি। আব্বার নাম আফ্‌ফান, মায়ের নাম আরওরা বিনতু কুরাইশ। বংশের দিক থেকে কুরাইশ বংশের উমাইয়া শাখার লোক ছিলেন তিনি। তাঁর মা আরওরা মহানবী (সা.)-এর ফুফাতো বোন ছিলেন অর্থাৎ ওসমান ছিলেন মহানবী (সা.)- এর ভাগিনা।

তিনি ৫৭৬ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ছ'বছর পরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি ছিল, গণী, যুননূরাইন, আস সাবেকুনাল আওয়ালূন ও যুল হিজরাতাইন। তাঁর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে একজন শিক্ষিত মানুষ ছিলেন তা দিবালোকের মত পরিষ্কার। 'কাতিবে অহী' অর্থাৎ অহী লেখক হযরত ওসমান তাঁর যুগের অন্যতম কুষ্ঠিবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। তিনি কুরাইশদের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আদ্যপান্থ জ্ঞান রাখতেন। তিনি পণ্ডিত অথচ বিনয়ী ছিলেন। তাঁর সৌজন্য ও লৌকিকতা বোধের কথা কিংবদন্তী হয়ে আছে। তিনি অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের মানুষ ছিলেন। সাথে সাথে ছিলো তাঁর প্রখর আত্মমর্যাদা বোধ। যৌবনে হযরত ওসমান (রা.) অন্যান্য কুরাইশদের মত ব্যবসা শুরু করেন। সততা নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার গুণে তিনি ব্যবসায়ে অসম্ভব সাফল্য অর্জন করেন। এমনকি অতি অল্প কালের মধ্যেই প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হওয়ার কারণে তিনি গণী উপাধিতে ভূষিত হন। রাসূলের (সা.) নবুওয়ত প্রাপ্তির প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন হযরত ওসমান (রা.) তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি

www.icsbook.info

নিজেই বলেন, 'আমি ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ।' খোঁজ খবর নিয়ে যতদূর জানা যায় হযরত আবূ বকর , আলী ও যায়িদ ইবনে হারিসের পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এজন্য হযরত ওসমানকে আস সাবেকুনাল আওয়ালূন বা প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী বলা হয়। আর রাসূল (সা.) যে ছ'জন প্রধানতম সাহাবীর প্রতি আমৃত্যু খুশী ছিলেন, তিনি তাঁদের মধ্যে একজন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি ছিলেন ' আশারায়ে মুবাশ্‌শারা'র অন্তর্গত। হযরত ওসমান (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে নানা কথা শোনা যায়। কেউ কেউ বলেন, তাঁর খালা সু'দা ঐ যুগের একজন বিশিষ্ট 'মাহিন ' বা ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন। তিনি ওসমানকে মহানবী সম্বন্ধে আগাম কিছু কথা বলেন এবং তাঁর অনুরক্ত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। এই খালার উৎসাহতেই তিনি ইসলাম কবুল করেন। অন্য মতে ওসমান যখন সিরিয়া সফরে যান সে সময়ে তিনি 'মুয়ান ও যারকার' মধ্যবর্তী জায়গায় বিশ্রাম করছিলেন, এক পর্যায়ে তাঁর তন্দ্রা আসলে তিনি শুনতে পান, 'ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা, তাড়াতাড়ি কর। আহমদ নামের রাসূল মক্কায় আত্ম প্রকাশ করেছেন।' মক্কায় ফিরে তিনি খোঁজ নিয়ে জানলেন ঘটনা সত্য। এরপর তিনি প্রিয় বন্ধু আবূ বকর সিদ্দিকের আহ্বানে ইসলাম কবুল করেন । ইসলাম কবূলের পর ওসমানকে স্বাগত জানিয়ে তার খালা সু'দা একটি কাসীদা লিখেন।

ওসমানের ভাই-বোনসহ পরিবারের সবাই ইসলাম কবূল করেছিলেন। তাঁর বোন উম্মে কুলসুম সেই সৌভাগ্যবতী কুরাইশ বধূ যিনি প্রথম রাসূল (স) হাতে বাইয়াত হন। ওসমান ইবনে আফ্‌ফান ছিলেন একজন ধনকুবের ও অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি । কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ওপরও নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন। তাঁরই চাচা হাকাম ইবন আবিল 'আস' ইসলাম গ্রহণের কারণে তাকে বেঁধে পিটাতো আর বলতো, 'এ নতুন ধর্মগ্রহণ করে তুমি আমাদের বাপ-দাদার মুখে কালি দিয়েছো। এ ধর্ম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়া হবে না।' কিন্তু সত্যের সাধক, মর্দে মুমীন ওসমান (রা.) এ সময়

www.icsbook.info

অবিচল থেকেছেন এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'তোমাদের যা ইচ্ছে করতে পার, আমি এ দ্বীন কখনো ছাড়বো না।' ইসলাম গ্রহণের পর নবী নন্দিনী রুকাইয়াকে বিয়ে করেন। হিজরী দ্বিতীয় সনে রুকাইয়া ইন্তেকাল করেন। রাসূল (সা.) ওসমানের ওপর এতো বেশী খুশী ছিলেন যে রুকাইয়ার ইন্তেকালের পর তিনি অপর কন্যা উম্মে কুলসুমকে ওসমানের সাথে বিবাহ দেন। এ জন্যই তাঁর উপাধি 'যুননূরাইন' অর্থাৎ দুই জ্যোতির অধিকারী । উম্মে কুলসুম হিজরী ৯ সনে নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। কুলসুমের মৃত্যুর পর রাসূল (সা.) বলেন, 'আমার যদি তৃতীয় কোন মেয়ে থাকতো তাকেও আমি ওসামনের সাথে বিয়ে দিতাম।' রুকাইয়ার সাথে ওসমানের দাম্পত্য জীবন ছিল খুব মধুর। ওসমান যখন অন্যান্য মুসলমানদের সাথে হাবসায় হিজরত করেন তখন রুকাইয়া তাঁর সাথে ছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) সেই ব্যক্তি যিনি মদীনায়ও হিজরত করেন। এ জন্যই তাঁকে 'যুল হিজরাতাইন' অর্থাৎ দুই হিজরতের অধিকারী বলা হয়। হযরত ওসমান নরম দিলের মানুষ ছিলেন কিন্তু অপর দিকে ছিলেন সাহসী যোদ্ধা। তিনি একমাত্র বদর ছাড়া অপর সকল যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বদর যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ ছিল বদরের যুদ্ধে যাওয়ার সময়ে ওসমানের স্ত্রী নবী দুহিতা হযরত রুকাইয়া ছিলেন দারুণভাবে অসুস্থ । যে জন্যে রাসূল (সা.) তাঁকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেন। ঘটনাক্রমে যেদিন বদরের যুদ্ধে মুলমানদের বিজয়ের সংবাদ মদীনায় পৌছায় ঐ দিনই রুকাইয়া ইন্তেকাল করেন। রুকাইয়ার একজন পুত্র সন্তান ছিল নাম আবদুল্লাহ। এ কারণেই ওসমানের ডাক নাম হয় আবূ আবদুল্লাহ । কিন্তু আবদুল্লাহ হিজরী ৪ সালে মারা যান।

দান দক্ষিণার ক্ষেত্রে ওসমানের ভূমিকা কিংবদন্তির মত সারা বিশ্বে মশহুর হয়ে আছে । আল্লাহ যেমন তাঁকে প্রভূত সম্পদ দান করেছিলেন তেমনি তাঁর দিলও করেছিলেন অনেক বড়। যতদূর জানা যায় ঐ সময়ে আরবে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধনী। কিন্তু তিনি তাঁর ধন সম্পদকে কুক্ষিগত করে রাখেননি। ইসলাম গ্রহণের পরে তাঁর সম্পদ

www.icsbook.info

মুসলমানদের কল্যাণে বিলিয়ে দেন। তাবুক যুদ্ধের খরচের জন্য সাহাবীরা অত্যন্ত খোলা মনে যুদ্ধফাণ্ডে অকাতরে সাহায্য করলেন। এ সময়ে হযরত ওমর তাঁর সম্পদের অর্ধেক এনে রাসূল (সা.)-এর হাতে তুলে দিলেন। হযরত আবূ বকর দিলেন তাঁর সমস্ত অর্থ। আর হযরত ওসমান পুরা যুদ্ধের এক তৃতীয়াংশের ব্যয়ভার বহন করলেন। এ যুদ্ধে তিনি সাড়ে নয় শো উট, পঞ্চাশটি ঘোড়া ও এক হাজার দিনার দান করেন। সেদিন ওসমানের দানে রাসূল (সা.) এতো খুশী হয়েছিলেন যে দিনার গুলো নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি বলেন, 'আজ থেকে ওসমান যা কিছুই করবে, কোন কিছুই তার জন্য ক্ষতিকর হবে না।' একটি বর্ণনায় আছে, 'তাবুকের যুদ্ধে তাঁর দানে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (সা.) তাঁর আগে পিছের সকল গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করেন এবং তাঁকে জান্নাতের ওয়াদা করেন।'

শুধু তাবুক যুদ্ধেই নয় অন্যান্য যুদ্ধের প্রস্তুতি লগ্নেও তিনি মন খুলে দান করতেন।

তোমরা নিশ্চয় হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা শুনেছো । এই সন্ধি হবার আগে হযরত ওসমানকে নিয়ে দারুণ আবেগময় একটা ঘটনা ঘটেছিলো। রাসূল (সা.) সাহাবা কেরামসহ হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার অদূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাবু গাড়েন। পরে মক্কার নেতৃবৃন্দকে অবহিত করার জন্য হযরত ওসমানকে এ খবর দিয়ে পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধ নয়, বরং বাইতুল্লাহর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছি।'

ওসমান (রা.) রাসূল (সা.)-এর বার্তা নিয়ে মক্কায় পৌঁছালে আরব নেতৃবৃন্দ তাঁকে তওয়াফ করার অনুমতি দেন। কিন্তু তিনি তা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সা.) যতক্ষণ তওয়াফ না করেন ততক্ষণ আমি তওয়াফ করতে পারিনা।' তাঁর স্পষ্ট কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে বেঈমান কাফেররা তাঁকে তিনদিন আটকে রাখে। কিন্তু ঘটনাক্রমে হুদাইবিয়ার মুসলিম শিবিরে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মক্কার কাফেররা ওসমান (রা.) কে শহীদ করেছে। এ সংবাদ শোনার

www.icsbook.info

সাথে সাথে রাসূল (সা.) ঘোষণা করলেন, 'ওসমানের রক্তের বদলা না নিয়ে আমরা প্রত্যাবর্তন করবো না। রাসূল (সা.) তাঁর ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে বলেন, 'হে আল্লাহ। এ বাইয়াত ওসমানের পক্ষ থেকে। সে তোমার ও তোমার রাসূলের কাজে মক্কায় গেছে।' মক্কা থেকে ফিরে এসে বাইয়াতের কথা জানতে পেরে ওসমান (রা.) নিজেও রাসূল (সা.)-এর হাতে বাইয়াত হন। ইতিহাসে এ বাইয়াত বাইয়াতু শাজারা, বাইয়াতু রিদওয়ান ইত্যাদি নামে পরিচিত। তোমরা শুনলে খুশি হবে যে, পবিত্র কোরআনে এ বাইয়াতের প্রশংসা করে আয়াত নাযিল হয়।

ওসমান (রা.) অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ ছিলেন। তিনি সব কিছুকেই স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারতেন। রাসূল (সা.) ওফাতের পর পরই খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে যখন তিনি শুনলেন আবূ বকরের হাতে বাইয়াত নেয়া হচ্ছে তখন তিনি দ্রুত সেখানে যান ও বিনা বাক্য ব্যয়ে আবূ বকরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। হযরত ওমরের (রা.) হাতে তিনিই প্রথম বাইয়াত হন। পরে তাঁর দেখাদেখি অন্যান্যরাও বাইয়াত গ্রহণ করেন। আনন্দের ব্যাপার হলো ওমর (রা.) কে খলীফা মনোনীত করে হযরত আবূ বকর (রা.) যে অঙ্গীকার পত্রটি লিখে যান তার লেখক ছিলেন স্বয়ং ওসমান (রা.)।

হযরত ওমর (রা.) কাউকে খলীফা হিসাবে মনোনয়ন দিয়ে যাননি। তিনি আলী, ওসমান, আবদুর রহমান, সা'দ, যুবাইর ও তালহা এই ছয়জনের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করেন তাঁর মৃত্যুর তিন দিন তিন রাত্রি পর। হযরত ওমর (রা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তালহা মদীনায় ছিলেন না। তাই ওপরের বাকী পাঁচজন হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরায় একত্রিত হলেন, এ সময় তাঁদের সাথে ছিলেন হযরত ওমরের (রা.) পুত্র আবদুল্লাহ (রা.)। খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে যাঁকে ওমর (রা.) সহযোগিতা করতে বলেছিলেন। অনেক আলাপ আলোচনার পর উক্ত ছয়জন হযরত আবদুর রহমানকে শালিশ

www.icsbook.info

নির্বাচন করেন, অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব দেন।

হযরত আবদুর রহমান বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম, সেনা কর্মকর্তা, বিশিষ্ট নাগরিকসহ সর্বস্তরের প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষ জনের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। এরপর ১লা মুহাররম ২৪ হিজরীতে মসজিদে নব্বীতে প্রচুর লোকের সামনে খলীফা হিসাবে ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)-এর নাম ঘোষণা করেন। সংগে সংগে উপস্থিত জনতা ওসমান (রা.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন ।

খিলাফতের দায়িত্ব ওসমান (রা.) যথাযথ দায়িত্বশীলতার সাথে পালন করেন। তিনি সর্বমোট প্রায় বার বছর এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁর দায়িত্ব প্রাপ্তির প্রথম ছয় বছর দেশে শান্তি শৃংখলা বিরাজিত ছিল কিন্তু দ্বিতীয় ছয় বছরে তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম কথা ওঠে। এখানে তোমাদের একটা কথা জেনে রাখা দরকার যে, এসময়ে খলীফা শাসিত অঞ্চলে যথেষ্ঠ ইয়াহুদি খৃষ্টান বাস করতো। মুসলমানদের শাসনে থাকার কারণে তারা প্রথম দিকে চুপচাপ ছিল ঠিকই কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো ততই এসব পরাজিত শক্তি মাথা চাড়া দিতে লাগলো । মূলত এরাই হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলো। দুর্বল ঈমানের মুসলমানরাও এ সমস্ত চক্রান্ত কারীদের ফাঁদে সহজেই পা দিলো। ফলে খুব দ্রুত অবস্থার অবনতি হলো। বিদ্রোহীরা খলীফার বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে রোজাদার খলীফাকে কোরআন তেলাওয়াত রত অবস্থায় হত্যা করলো। ঘটনাটি ঘটে হিজরী ৩৫ সনের ১৮ই জিলহজ শুক্রবার বাদ আসর। মাগরিব ও এশার মাঝামাঝি সময়ে যুবাইর ইবন মুতঈম (রা.)-এর ইমামতিতে জান্নাতুল বাকীর হাশশে কাওয়ার নামক অংশে ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.) কে দাফন করা হয়। তাঁর শাহাদাতের সময় মুসলিম বিশ্বের বিস্তৃতি ছিলো কাবুল থেকে মরক্কো পর্যন্ত।

তোমরা হয়ত ভাবছো এতো বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক অথচ

www.icsbook.info

গুটিকতক বিভ্রান্ত লোকের হাতে শহীদ হলেন? ইচ্ছে করলে তিনি বিদ্রোহীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতেন কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী এবং নরম মনের মানুষ । তিনি নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য রক্তপাতকে পছন্দ করেন নি। তাছাড়া এ বিদ্রোহীদের মধ্যে মুসলমানরাও রয়েছে। তাই নিজের জীবন দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন, খলীফার জীবনের চেয়ে সম্প্রীতি রক্ষা করা বড়।

তোমরা শুনলে অত্যন্ত আনন্দিত হবে যে, ওসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর একান্ত প্রিয় ভাজন ছিলেন। রাসূল (সা.) নিজেই বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবে ওসমান।'

www.icsbook.info

হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.)

রাসূল (সা.)-এর যুগে কোন একদিন তিনজন লোক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এদের একজনের কাছে পাঁচটি রুটি ও সেই পরিমাণ তরকারী, দ্বিতীয় জনের কাছে তিনটি রুটি ও সমপরিমাণ তরকারী ছিল কিন্তু তৃতীয় জনের কাছে কিছুই ছিলো না। পথ চলতে চলতে খাবার সময় উপস্থিত হলে তিনজন একসঙ্গে বসে খেলো। তৃতীয় জন খাবার পর এদের নিকট থেকে বিদায় হয়ে গেলো এবং যাবার সময় আটআনা পয়সা দিয়ে গেলো। কিন্তু গোল বাঁধলো ঐ পয়সা নিয়ে। প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ পাঁচটি রুটির মালিক বললো, যেহেতু রুটি ছিলো আমার পাঁচটি আর তোমার তিনটি সেহেতু পয়সা আমি পাবো পাঁচ আনা আর তুমি পাবে তিন আনা। দ্বিতীয় জনের দাবি আমার রুটি তিনটি আর তোমার পাঁচটি একথা সত্য, তবে যেহেতু রুটি সবাই সমান খেয়েছি সেজন্য পয়সাও সমান সমান ভাগ হবে। অর্থাৎ তুমি চার আনা আমি চার আনা। এভাবে অনেক্ষণ তর্কাতর্কির পর যখন কেউ কারো দাবি ছাড়লো না তখন তারা হযরত আলী (রা.)-এর নিকট এসে বিচার প্রার্থনা করলো। হযরত আলী সব শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে প্রথম ব্যক্তির প্রস্তাবানুযায়ী তিন আনা নিয়ে খুশী হতে বললেন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি গো ধরে বললো, না জনাব! আমি আপনার পক্ষ থেকেই বিচার আশা করি।' হযরত আলী তখন বলল্লেন, 'আমার বিচার অনুযায়ী তুমি পাবে এক আনা আর প্রথম ব্যক্তি পাবে সাত আনা।'

হযরত আলীর কথা শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তির চক্ষুতো ছানাবড়া! তার অবাক হবার ভাব দেখে হযরত আলী বললেন, 'বুঝলে না! তোমাদের কথানুযায়ী তোমাদের মোট রুটি ছিলো আটটি। কিন্তু তিনজন মানুষ তো আর আটটি রুটি সমান ভাগ করে খেতে পারে না। তাই প্রত্যেকটি

www.icsbook.info

রুটিকে যদি সমান তিনভাগে ভাগ করা হয় তাহলে আটটিতে হয় মোট চব্বিশটি টুকরা, আর প্রত্যেকের ভাগের ভাগ পড়ে আট টুকরা করে। এখানে তোমার রুটি ছিলো তিনটি, তাতে হয় নয়টি টুকরা। এই নয়টির মধ্যে তুমি খেয়েছো আটটি, আর থাকে মাত্র একটি। অপর দিকে প্রথম ব্যক্তির পাঁচটি রুটিতে হয় পনেরটি টুকরা- সে খেয়েছে আটটি টুকরা । তাহলে বাকী থাকে সাতটি টুকরা। তাই প্রথম ব্যক্তি তার সাত টুকরার জন্য পাবে সাত আনা আর তুমি তোমার এক টুকরার জন্য পাবে এক আনা।' দেখলে তো কি সুন্দর বিচার। আর এ বিচার ক্ষমতার কারণেই রাসূল (সা.) হযরত আলীকে ইয়েমেনের বিচারপতি নিযুক্ত করেছিলেন।

নাম আলী। পুরো নাম আলী ইবন আবূ তালিব। ডাক নাম ছিলো আবুল হাসান ও আবূ তুরাব। তাঁর উপাধি ছিলো হায়দার, মুরতাজা ও আসাদুল্লাহ। আব্বার নাম আবূ তালিব আবদু মান্নাফ, মায়ের নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ। ঘটনাক্রমে আব্বা আম্মা উভয়েই কুরাইশ বংশের হাশিমী শাখার লোক। সব থেকে আনন্দের কথা হলো তিনি স্বয়ং নবী করীম (সা.)-এর আপন চাচাত ভাই।

মহানবী(সা.)-এর ত্রিশ বছর বয়সে হযরত আলী কাবা ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.) ছাড়া অন্য কেউই কাবা ঘরের মত জায়গায় জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন নি। তা'ছাড়া তাঁর যে দুটি নাম হায়দার ও আলী রাখা হয়েছিলো তাও ছিলো ব্যতিক্রমধর্মী। সত্যি বলতে কি এর পূর্বে সমগ্র আরবে এ ধরনের নাম আর কারো ছিলনা। সে জন্য আবূ তালিব এ নামকে এলহামী নাম বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূল (সা.)-এর চাচা আবূ তালীব ছিলেন দরিদ্র মানুষ। তা'ছাড়া তাঁর পরিবারের লোক সংখ্যাও ছিলো বেশী। হযরত আলী (রা.)-এর বয়স যখন পাঁচ বছর আরব দেশে তখন খাদ্যাভাব দেখা দেয়, তাই চাচার ওপর থেকে চাপ কমানোর জন্য মহানবী (সা.) আলী (রা.) কে নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন। এরপর আলী (রা.) আর পিতার সংসারে ফিরে যাননি। রাসূল (সা.) যখন নবূওয়ত প্রাপ্ত হন

www.icsbook.info

তখন আলী (রা.)-এর বয়স দশ-এগার বছর হবে। আলী একদিন অবাক হয়ে দেখলেন ঘরের ভেতর রাসূল (সা.) ও হযরত খাদিজা (রা.) মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আছে অর্থাৎ সিজদাহ্ করছেন। আলী (রা.), 'এ কি হচ্ছে জানতে চাইলে।' রাসূল (সা.) বললেন, 'এক আল্লাহর ইবাদত করছি। তোমাকে এ পথে আসার দাওয়াত দিচ্ছি।' হযরত আলী নির্দ্বিধায় দাওয়াত কবূল করলেন।

পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম ইসলাম কবূল করেন এ নিয়ে মতভেদ আছে। সালমান ফারসী (রা.) ও ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে হযরত খাদীজা (রা.)-এর পর হযরত আলী প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, মহিলাদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল ক্বোবরা, বয়স্কদের মধ্যে হযরত আবূ বকর, দাসদের মধ্যে যায়িদ বিন হারিসা, কিশোরদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) প্রথম ইসলাম কবূল করেন।

নবূওয়তের চতুর্থ বছরে আত্মীয় স্বজনের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর নির্দেশ আসলে রাসূল (সা.) সাফা পর্বতের ওপর দাঁড়িয়ে, 'হে আহলে গালেব' বলে হাক ছাড়লেন। এ ডাকে কোরাইশগণ পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হলো কিন্তু রাসূল(সা.)-এর কথা শুনে তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং আজে বাজে কথা বলে চলে গেলো। এরপর হযরত আলীর সহযোগীতায় রাসূল (সা.) নিজ বাড়িতে কিছু লোককে আপ্যায়নের জন্য দাওয়াত দিলেন। এতে আবূ লাহাব, আবূ তালিব, হযরত হামযা, হযরত আব্বাসসহ প্রায় চল্লিশজন লোক উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে রাসূল (সা.) বললেন, 'হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ। আমি তোমাদের জন্য সেই বস্তু নিয়ে এসেছি, যা তোমাদেরকে ইহ-পরকালের উত্তম নেয়ামতসমূহ দিয়ে ভূষিত করবে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে?"

এহেন আহবানের পরও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ চুপ থাকলো, কেউ কোন কথা বললো না। হঠাৎ কিশোর আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি

www.icsbook.info

আপনাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম বয়সী আর রুগ্ন। তবুও আমি আপনাকে সাহায্য করবো।' একথা তিনি রাসূল (সা.)-এর আহবানের প্রেক্ষিতে তিনবার বললেন। তৃতীয়বার বলার পর রাসূল (সা.) বললেন, 'তুমিই আমার ভাই এবং ওয়ারিশ হবে।' সত্যি কথা হলো এরপর সর্বাবস্থায় আলী (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাহায্যকারী ছিলেন।

যতই দিন যেতে লাগলো মুসলমানদের ওপর কাফির মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতন বেড়ে চললো। এক পর্যায়ে নবী (সা.)-এর নির্দেশে কিছু লোক হাবশায় হিযরত করলেন, পরবর্তীতে মদীনায়। নবুওয়াত প্রাপ্তির তেরো বছরে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সা.)-এর হিজরত করার হুকুম হলো। ওদিকে কুরাইশগণ ইসলামের অগ্রযাত্রা রুখতে না পেরে খোদ রাসূল (সা.) কেই হত্যার ষড়যন্ত্র করলো। ঠিক হিজরতের দিন তারা রাসূল (সা.)-এর বাড়ি ঘেরাও করলো। কাফিররা সন্দেহ না করে এ জন্যে নবী (সা.) হযরত আলীকে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন এবং গোপনে বাড়ি থেকে সিদ্দিকে আকবরের হাত ধরে বের হয়ে গেলেন। এদিকে রাসূল (সা.) কে নিরাপদে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সুযোগ দিতে পেরে শেরে খোদা নিশ্চিন্তে ঘুমালেন। তিনি জানতেন, যে কোন মুহূর্তে কাফেররা ঘরে ঢুকে মুহাম্মদ (সা.) মনে করে এক কোপে তাকে দু'খণ্ড করে ফেলতে পারে, নির্মমভাবে তাকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু যাঁর মনে রয়েছে আল্লাহর ভয়, সে কি কখনো মানুষের ভয়ে ভীত হয়? রাসূল (সা.)-এর জন্য জীবন দেয়া তো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

সকাল হতে না হতেই কাফেররা ঘরে ঢুকে দেখলো মুহাম্মদ (সা.)-এর জায়গায় শুয়ে আছে তারই ভক্ত, আপন চাচাতো ভাই আলী ইবন আবূ তালিব। নিশ্চিত শিকার হাত ছাড়া হওয়ায় কাফেরগণ ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে গেলো।

রাসূল (সা.) যখন আলীকে নিজ বিছানায় রেখে যান তখন তাকে বলেন, 'আমি চললাম। তুমি এ সমস্ত আমানত তাদের মালিকের

www.icsbook.info

নিকট পৌঁছে দিয়ে মদীনায় চলে এসো।' হযরত আলী নিজেই এ ব্যাপারে বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনা রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি মক্কায় থেকে যাবো এবং লোকদের যে সব আমানত তাঁর কাছে আছে তা ফেরত দেবো। এ জন্যই তো তাঁকে 'আল- আমীন' বলা হতো।'

আমি তিনদিন মক্কায় থাকলাম। তারপর রাসূলুল্লাহর (সা.) পথ ধরে মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়লাম। অবশেষে বানূ 'আমর ইবন আওয়াফ যেখানে রাসূল (সা.) অবস্থান করছিলেন, আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। কুলসুম ইবন হিদামের বাড়িতে আমার আশ্রয় হলো।'

রাসূল (সা.) হযরত আলীকে অত্যাধিক স্নেহ করতেন কিন্তু এ ঘটনায় তিনি এতো খুশি হয়েছিলেন যে, আলী যখন মদীনায় তাঁর কাছে পৌঁছুলেন তখন তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, কপালে চুমো দিলেন, এমনকি নিজ হাতে আলীর পোষাকের ধূলোবালি ঝেড়ে দিলেন।

মাদানী জীবনে রাসূল (সা.) যখন মুহাজির ও আসনারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন তখন এক পর্যায়ে হযরত আলী রাসূল (সা.) কে বললেন , 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনি আমাকে তো কারো ভাই বানাইয়ে দিলেন না।' একথা শুনে রাসূল (সা.) আলীর কাঁধে একটি হাত রেখে বললেন, 'হে আলী! দুনিয়া এবং আখিরাতে তুমিই আমার ভাই।' বুঝতেই পারছো হযরত আলী কত বড় সৌভাগ্যবান মানুষ ছিলেন। অবশ্য পরে রাসূল (সা.) হযরত আলী ও সাহল বিন হুনাইফের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন।

হিজরী দ্বিতীয় সনে নবী নন্দিনী খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা.)-এর সাথে হযরত আলী (রা.) শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। স্বয়ং নবী (সা.) এ বিয়ে পড়ান এবং নিজের অজুর পানি দুলহা ও দুলহীনের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে দোয়া করেন। নবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে ফাতিমার জন্য হযরত আলীই ছিলেন উপযুক্ত পাত্র। তিনি নিজেই বলেছেন, 'যদি আলী না হতো, তাহলে ফাতিমার জন্য স্বামী পাওয়া যেতো না।'

www.icsbook.info

শেরে খোদা হযরত আলী একমাত্র তাবুক অভিযান ছাড়া অন্য সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বদরের যুদ্ধে যে দুটি কালো রংয়ের পতাকা মুসলমানদের ছিলো তার একটি ছিলো মহানবী (সা.)-এর হাতে অপরটি হযরত আলী (রা.)-এর হাতে। বদরের যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদের জন্য উপযুক্ত স্থানও আলী নির্বাচন করেন। এ যুদ্ধে প্রথমেই উভয় পক্ষের তিনজন করে যোদ্ধা মুখোমুখি হয়- রাসূল (সা.)-এর ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র আলী স্বীয় প্রতিপক্ষ ওলীদকে আক্রমণ করে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন। এরপর শাইবাকে হযরত উবাইদা (রা.)-এর উপর আক্রমণ করতে দেখে আলী মুহূর্তের মধ্যে শাইবাকে আক্রমণ করে ধরাশায়ী করেন। এরই ফলে পুরো যুদ্ধের মোড় পাল্টে যায়। এবং মুসলমানদের জয় হয়। এমনিভাবে সকল যুদ্ধে তিনি বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। যার কারণেই রাসূল (সা.) তাঁকে হায়দার উপাধিতে ভূষিত করেন এবং 'জুলফিকার' নামক তরবারিটি উপহার দেন। সব থেকে আনন্দের কথা হলো রাসূল (সা.)- এর যুগের সকল যুদ্ধেই তিনি ছিলেন মুসলমানদের নিশানবর্দার বা পতাকাবাহী। বদর যুদ্ধের কথা তো আগেই বলেছি। ওহুদের যুদ্ধে যে ক'জন মুজাহিদ রাসূল (সা.) কে রক্ষা করার জন্য জানবাজী রেখে বুহ্য রচনা করেছিলেন, হযরত আলী তাদের অন্যতম।

খন্দকের যুদ্ধের প্রথমে, 'আমর ইবন আবদে উদ্দ বর্ম পরে বের হলো। সে হুংকার ছেড়ে বললো, 'কে আমার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে? আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর নবী, আমি প্রস্তুত। রাসূল (সা.) বললেন, 'এ হচ্ছে আমর তুমি বসো।' এভাবে আমর তিনবার আহবান করলো, হযরত আলীও তিনবার রাসূল (সা.)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। শেষ বারও রাসূল (সা.) বললেন, সে তো আমর। উত্তরে আলী (রা.) বললেন, 'তা হোক'। এরপর উভয়ে মুখোমুখি হলো এ সময়ে আলী একটি কবিতা আবৃতি করছিলেন। আমর খাপ থেকে তরবারি বের করেই আলী'র ঢাল এক আঘাতেই ফেড়ে ফেললো। আলীও পাল্টা আঘাতে আমরকে ধরাশায়ী করে

www.icsbook.info

ফেললেন। এ দৃশ্য দেখে খোদ রাসূল (সা.) আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। আমরকে নিকেশ করে আলী নিজের একটি কবিতা আবৃতি করতে করতে রাসূলের কাছে ফিরে আসেন।

খাইবার অভিযানের কথা তো তোমরা নিশ্চয় জানো। যখন হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.) কিল্লাগুলি দখল করতে ব্যর্থ হলেন তখন রাসূল (সা.) বললেন, 'কাল আমি এমন এক বীরের হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেবো, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়পাত্র। তারই হাতে কিল্লাগুলির পতন হবে।' পরদিন সকালে সবাই জানলো এ দায়িত্বের ভার পড়েছে হযরত আলী হায়দারের ওপরে। হযরত আলী (রা.) কিল্লার নিকটবর্তী হলে দেওয়ালের ওপর হতে জনৈক ইহুদী জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি? হযরত আলী বললেন, আলী ইবনে আবূ তালিব। অতপর ইহুদি বললেন, আমি তওরাত কিতাবে পাঠ করেছি, এই ব্যক্তি যবরদস্ত এবং দুঃসাহসী বীর। জয় করা ছাড়া এই ব্যক্তি এই স্থান ছাড়বে না। সুতরাং তাঁকে বিনা রক্তপাতে কিল্লা ছেড়ে দিলেই ভাল হয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা- ইহুদির এই সু পরামর্শ কেউ গ্রহণ করেনি।

খায়বার জয় করে ফিরলে রাসূল (সা.) আলীর কপালে চুম্বন এঁকে দিয়ে বললেন, 'তোমার এ কাজে আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেস্তাগণ খুশী হয়েছেন।'

তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছি তাবুক যুদ্ধে আলী (রা.) অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। এর কারণ ছিলো তাবুক অভিযানকালে স্বয়ং রাসূল (সা.) তাঁকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। অবশ্য আলী (রা.) যুদ্ধেই যেতে চেয়েছিলেন। এ সময় তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলূল্লাহ, আপনি যাচ্ছেন, আর আমাকে নারী ও শিশুদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছেন?' উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন, 'হারুণ যেমন ছিলেন মূসার, তেমনি তুমি হচ্ছো আমার প্রতিনিধি। তবে আমার পরে কোন নবী নেই।'

অষ্টম হিজরী সনে মক্কা বিজয় সংগঠিত হয়। এ সময়ে হযরত আলী

www.icsbook.info

মুহাজিরীনদের পতাকাবাহী ছিলেন। কাবা ঘরে প্রবেশ করে রাসূল (সা.) হাজরে আসওয়াদে চুমা খেলেন এরপর মূর্তিগুলো বাইরে ফেলে দিলেন। একটি মূর্তি অপেক্ষাকৃত উচু জায়গায় থাকায় রাসূল (সা.) হযরত আলীকে নিজ কাঁধে উঠিয়ে সেটা নামিয়ে ফেলেন।

নবম হিজরী সনে সিদ্দিকে আকবরকে আমীরুল হজ্ব নিযুক্ত করা হয়। পরে সূরা বারাআত নাযিল হলে কাফিরদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিলের জন্য নবী (সা.) আলী (রা.) কে প্রতিনিধি করে পাঠান। হযরত আলী জনসাধারণকে জানালেন, 'এই বছরের পর হতে কোন মুশরিক হজ্ব করতে পারবেনা এবং কোন ব্যক্তিই উলঙ্গ অবস্থায় কাবা ঘরে তাওয়াফ করতে পারবেনা। আর যে ব্যক্তি রাসূলূল্লাহ (সা.)-এর সাথে কোন প্রকারের ওয়াদা করেছে সে যেন তা পূর্ণ করে।

দশম হিজরীতে রাসূল (সা.) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আলী (রা.) কে ইয়েমেন পাঠান। আলী ইয়েমেন রওয়ানা হওয়ার সময় স্বয়ং রাসূলে খোদা তাঁর মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দেন এবং দোয়া করেন। অল্প দিনের মধ্যেই ইয়েমেনবাসী ইসলাম কবূল করে। আলী (রা.) যখন ইয়েমেন ছিলেন তখন তাঁকে দেখার জন্য রাসূল (সা.) ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি দোয়া করেন, 'আলীকে না দেখে যেনো আমার মৃত্যু না হয়।' বিদায় হজ্বের দিন আলী ইয়েমেন থেকে এসে হাজির হন।

রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর গোসল দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন যিনি তিনি হলেন আলী (রা.)।

হযরত আলী তাঁর পূর্ববর্তী তিনজন খলীফাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। তিনি কখনই পদলোভী ছিলেন না। সে জন্যই হযরত ওসমানের শাহাদাতের পর তিনি খলীফার দায়ভার নিতে চাননি। পরে মদীনা বাসীদের চাপাচাপির কারণে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব নিতে রাজি হন। তবে তিনি শর্ত দেন যে, তাঁর বাইয়াত প্রকাশ্যে হতে হবে। পরে মসজিদে নব্বীতে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি খলীফা নির্বাচিত হন। মাত্র ১৫/১৬ জন বাদে সবাই তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীরা খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যে

www.icsbook.info

তিনজনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন তাঁরা হলেন হযরত তালহা, যুবাইর, ও আলী (রা.)। হযরত ওমর (রা.) মৃত্যুর পূর্বে খলীফা মনোনয়নের জন্য ছয়জন সাহাবীর নাম বলে যান। হযরত আলী তাঁদের অন্যতম। তিনি এ সময় আলী সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, 'লোকেরা যদি আলীকে খলীফা বানায়, তবে সে তাদেরকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করতে পারবে।' খলীফা থাকা কালে হযরত ওমর একবার বায়তুল মাকদাস সফর করেন। এই সফরকালীন সময়ের জন্য তিনি আলীকে (রা.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। মানে হযরত আলী (রা.) খলীফা হওয়ার পূর্বেই দু'দুবার এ পদে স্থলাভিষিক্ত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পূর্বেই বলেছি তাবুক অভিযান কালে খোদ নবী (সা.) তাঁকে এ দায়িত্ব দেন।

একটা জিনিস তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানা দরকার, ইসলাম প্রচারের প্রথম থেকেই মুসলমানদের ঘরে বাইরে শত্রু–রাসূল (সা.)-এর যুগেই যেমন প্রকাশ্যে কাফেররা শত্রুতা করতো, তেমনি ভেতরে ভেতরে মোনাফিকরাও শত্রুতা করতো। হযরত ওসমান (রা.)-এর সময় এসে মোনাফিকরা খুবই সুকৌশলে কাজ শুরু করে এবং হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ফলে তা আরো বিস্তৃতি লাভ করে। হযরত আলী (রা.) এমনি এক দুঃখজনক পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের খলীফা হন। খেলাফত প্রাপ্তির পরপরই তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয় হযরত ওসমান হত্যার বিচার করার জন্য। কিন্তু ঘটনা এমন ছিলো যে, হত্যাকারী কে তা সঠিক করে কেউ জানতো না। ওসমান (রা.)-এর স্ত্রী নাইলা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কাউকে চিনতে পারেন নি। ফলে কাউকে সাজা দেয়া যাচ্ছিলো না। চক্রান্তকারীরা এ সুযোগটিই গ্রহণ করলো তাদের প্রচারণায় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবাও ওসমান হত্যার বিচার দাবী করলেন। এঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবাইয়ের (রা.)-এর মতো ব্যক্তিত্বও ছিলেন। তাঁরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নেতৃত্বে মক্কা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করেন, সেখানে ওসমান হত্যার বিচার দাবি কারীদের

www.icsbook.info

সংখ্যা ছিলো বেশী।

এহেন সংবাদে হযরত আলী (রা.) সেনাদলসহ সেখানে পৌছান এবং দু'বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নেয়। যেহেতু উভয় পক্ষ সততার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো তাই আলাপ আলোচনার পর-বিষয়টির নিষ্পতি হয়। কিন্তু চক্রান্তকারীরা এ ধরনের পরিস্থিতির পক্ষে ছিলো না। তাই তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রাতের আঁধারে এক পক্ষ অপর পক্ষের ওপর আক্রমণ চালায়, আর প্রচার করতে থাকে যে অপর পক্ষ সন্ধির সুযোগ নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে। এতে যুদ্ধ আরো ভয়াবহ রূপ নেয়। উভয় পক্ষে প্রচুর শহীদ হয়। শেষমেষ হযরত আয়েশা (রা.) কে হযরত আলী (রা.) বুঝাতে সক্ষম হন। তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য যে, এই ভয়াবহ যুদ্ধে আশারায়ে মুবাশ্‌শারার দু'জন সম্মানিত সদস্য হযরত তালহা (রা.) ও যুবাইর (রা.) শহীদ হন। এ যুদ্ধ হিজরী ৩৬ সনের জমাদিউস সানী মাসে সংঘটিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে এটাই প্রথম আত্মঘাতী যুদ্ধ। এটাকে জংগে জামাল বা উটের যুদ্ধ বলা হয়।

হযরত আলী (রা.)-এর শাসনামলে আরেকটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় সিরিয়ার শাসনকর্তা হযরত মোয়াবিয়া (রা.)-র সাথে। এ যুদ্ধকে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ বলে। আলী (রা.) মিমাংসার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। হযরত মোয়াবিয়া (রা.)-র মূল কথা ছিল হযরত ওসমানের (রা.) হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত তিনি আলীকে খলীফা হিসাবে মানবেন না। আসলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো নিজে খলীফা হওয়া তাই তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই হযরত ওসমানের রক্তমাখা জামা ও ওসমানের স্ত্রী নায়েলার কর্তিত আঙ্গুল হযরত আলীর (রা.) বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার মানসে সিরিয়ায় প্রদর্শন করলেন। তাঁর লোকেরা এও বলে বেড়াতে লাগলো যে, 'হযরত ওসমান (রা.)- এর শাহাদাতে হযরত আলী'র (রা.) সক্রিয় অংশ রয়েছে এবং হন্তারা তাঁরই আশ্রয়ে রয়েছে। সুতরাং হযরত ওসমানের (রা.)- এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রা.)-এর সাহায্য

www.icsbook.info

করা এবং তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।' ফলে হিজরী ৩৭ সনের সফর মাসে হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা.) সৈন্যগণ সিফ্ফীন নামক স্থানে পরস্পর মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মুনাফিকগণ এটাই চাচ্ছিলো। তারা অতি উৎসাহের সাথে উভয় পক্ষকে নানা রকম ভাবে যুদ্ধে উৎসাহিত করে। কারণ উভয় পক্ষে ছিল ঘাপটি মেরে থাকা প্রচুর মুনাফিক। এই যুদ্ধে বিশিষ্ট সাহাবী আম্মার বিন ইয়াসির, খুযাইমা ইবন সাবিত, আবূ আম্মার আল মাযিনী প্রমুখ সাহাবীসহ হাজার হাজার মুসলমান শহীদ হন। প্রকাশ থাকে যে আম্মার বিন ইয়াসির সম্বন্ধে রাসূল (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, **'আফসোস একটি বিদ্রোহী দল আম্মারকে হত্যা করবে।'**

যুদ্ধে অবশ্য হযরত আলীর জিত হতে যাচ্ছিল কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। তাঁর সৈন্যরা বর্শার মাথায় কুরআন ঝুলিয়ে বলতে লাগলো, 'এই কুরআন আমাদের দ্বন্দ্বের ফয়সালা করবে।' অতএব যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হলো। আসলে হযরত আলী তো সব সময় চাচ্ছিলেন শান্তি কিন্তু যুদ্ধবাজ মুনাফিকরা তো তাঁকে ঘরে থাকতে দেয়নি। আবূ মূসা আশয়ারী হযরত আলীর পক্ষে এবং আমর ইবনুল আস্ হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষে সালিশ নিযুক্ত হলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমর ইবনুল আসের ধূর্তামীর জন্য সালিশী বোর্ড শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়। মুসলমানরা দুমাতুল জান্দাল থেকে ফিরে আসেন। তখন থেকে মুসলিম খিলাফত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

সিফ্ফীনের যুদ্ধের পর হযরত আলীর দল থেকে বারো হাজার লোক বের হয়ে হারুরায় চলে যায়। এরা 'খারেজী' নামে পরিচিত। অত্যন্ত চরম পন্থী এ দলটিকে বোঝানোর জন্য হযরত আলীর পক্ষ থেকে যথেষ্ট চেষ্টা চালানো হয় কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম হয়। তারা প্রচার করতে থাকে দ্বীনের ব্যাপারে কাউকে হাকাম বা সালিশ মানা কুফরী কাজ। সেই অনুযায়ী হযরত আলী আবূ মূসা আশয়ারীকে সালিশ মেনে কুরআনের খেলাপ কাজ করেছেন। অতএব হযরত আলী তাঁর আনুগত্য দাবী করার বৈধ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। এদের সাথেও

www.icsbook.info

হযরত আলী'র নাহরাওয়ান নামক স্থানে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বলা যায় এ যুদ্ধে খারেজীদের শক্তি প্রায় খতম হয়ে যায়।

নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর খারেজী সম্প্রদায়ের আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম, আল বারাক ইবন আবদুল্লাহ ও আমর ইবন বকর আত তামীমী নামক তিন ব্যক্তি গোপনে এক বৈঠক করে। এ বৈঠকে তারা সিদ্ধান্ত নিয় যে আলী, মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস্ এই তিনজনের কারণেই মুসলমানদের এত অশান্তি। তাই এঁদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক হযরত আলীকে ইবনুল মুলজিম, মুয়াবিয়াকে আল বারাক এবং আমর ইবনুল আসকে আমর হত্যার দায়িত্ব নিলো। তারা প্রতিজ্ঞা করলো, 'মারবে না হয় মরবে'। কাজটির জন্য সময় বেছে নেয়া হয় ৪০ হিজরী সনের ১৭ই রমজান ফজরের ওয়াক্ত। এরপর যে যার গন্তব্যে চলে যায়।

অভ্যাস মত হযরত আলী নামায পড়ার জন্য মানুষ-জনকে ডাকতে ডাকতে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, এ সময়ে ওঁৎ পেতে থাকা পাপিষ্ট ইবনে মুলজিম তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তিনি আহত হন। আহতাবস্থায় ঐ দিনই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

একই দিনে হযরত মুয়াবিয়াও একই সময়ে আহত হন কিন্তু তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। আর আমর ইবনুল আস ঐ দিন অসুস্থ ছিলেন তাই মসজিতে যাওয়া হয়নি। কিন্তু তাঁর পরিবর্তে ইমামতির জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন পুলিশ প্রধান খারেজা ইবনে হুজাফা। তাঁকেই আমর ইবনুল আস মনে করে শহীদ করা হয়।

হযরত আলী (রা.) মোট চার বছর নয় মাস খিলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। নানা জটিলতার মধ্যেও তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ঐ সময়ের একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ। বিচারের ক্ষেত্রে আলী'র তুলনা আলী নিজেই। হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফয়সালাকারী আলী।' তাঁর সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য হযরত ওমর প্রায়ই বলতেন, 'আলী না থাকলে ওমর হালাক হয়ে যেতো।'

www.icsbook.info

আলী (রা.) নিজেকে সব সময় অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মতই মনে করতেন। তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন কিন্তু কোন অভাবী মানুষ তার দরোজা থেকে ফিরতো না। এজন্য তাঁকে প্রায়ই সপরিবারে উপোষ থাকতে হতো। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। সর্বদা মোটা কাপড়ের পোশাক পরতেন, তাও আবার তালি দেওয়া। তিনি অনেক সময় মাটিতেই শুয়ে কাটাতেন। একবার রাসূল (সা.) তাঁকে মাটিতে শোয়া অবস্থায় দেখে ঠাট্টা করে বললেন, 'ইয়া আবা তূরাব'। এখান থেকেই তিনি 'আবূ তূরাব' নামে পরিচিত হন।

হযরত আলী ছিলেন কুরআনের হাফিয। রাসূল (সা.)-এর তত্ত্বাবধানেই তাঁর শিক্ষাজীবন কাটে। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সির ছিলেন। তিনি খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। রাসূল (সা.) নিজেই বলেছেন, 'আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী সেই নগরের প্রবেশদ্বার।' তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী খলীফাদের যুগে যাঁরা ফতোয়া দিতেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম।

হযরত আলী ছিলেন একজন বড় কবি ও সুবক্তা। তার একটি 'দীওয়ান' পাওয়া গেছে। যাতে অনেকগুলি কবিতার মোট ১৪০০ শ্লোক বর্তমান। 'নাহজুল বালাগা' নামে তাঁর বক্তৃতার একটি সংকলন আছে।

হযরত আলী তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমি যা বলছি তা কুরআনের কাছে জিজ্ঞেস করো। আমি ঠিক বলছি কি না। আল্লাহর কসম। এমন কোন আয়াত নেই যা আমি জানি না। তা রাতে নাজিল হয়েছে বা দিনে, যুদ্ধের ময়দানে নাজিল হয়েছে বা পর্বতের গুহায়। অর্থাৎ যেখানেই নাযিল হয়ে থাকুক না কেন, সমস্তই আমার জানা আছে।' তাঁর ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'খোদার কসম। রাসূল (সা.)-এর পর সমস্ত এলেমকে দশভাগ করে আলীকে একাই নয়ভাগ দেওয়া হয়েছে। আর মাত্র এক দশমাংশ অপরাপর সমস্তের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে।'

আলী (রা.)-এর জীবন অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, 'আলী'র (রা.) মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (সা.)

www.icsbook.info

থেকে যতো কথা বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোন সাহাবী সম্পর্কে তা হয়নি।'

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলীর পুরাতন বন্ধু যেরার ইবন যামরার কাছে আলী (রা.)-এর চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'অত্যন্ত দূরদর্শী, দুঃসাহসী, শক্তিশালী, ন্যায়বিচারক, প্রতিটি কথা এলেম ও হেকমতে পরিপূর্ণ, দুনিয়া ও দুনিয়ার নেয়ামতের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা পোষণকারী, রাত্রি জাগরণে আনন্দিত, পরকালের চিন্তায় মগ্ন, ঋতু এবং যুগ পরিবর্তনে আশ্চর্যান্বিত, সাদাসিধা পোশাক পরিধানকারী, সাধারণ আহার্যে অভ্যস্ত, মানবতার দিশারী, দানবীর, গরীবদের প্রতি আন্তরিক এবং স্নেহবান, ন্যায়ের সমর্থন ও অন্যায়ের ঘোর বিরোধিতা ছিল হযরত আলী (রা.)-এর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য' অতপর মুয়াবিয়া বলেন, 'আল্লাহর কসম, আবুল হাসান এমনই ছিলেন।'

আসলে হযরত আলী ছিলেন, মুসলমানদের জন্য অহংকার। এ জন্যই রাসূল (সা.) বলেছেন, 'একমাত্র মুমিনরা ছাড়া তোমাকে কেউ ভালবাসবে না এবং একমাত্র মুনাফিকরা ছাড়া তোমাকে কেউ হিংসা করবে না।'

www.icsbook.info

হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.)

নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসছে এক কিশোর। অসম্ভব উত্তেজনা তার চোখে মুখে। রাসূল (সা.)-এর কাছাকাছি আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'যুবাইর! এ সব কি? যুবাইর নামের কিশোরটি উত্তর দিলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জানতে পেরেছি যে, আপনাকে মুশরিকরা গ্রেফতার করেছে। তাই আমি তার প্রতিশোধ নিতে আগমন করেছি।' যুবাইরের কথা শুনে নবী (সা.) খুশি হলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। জানা যায় যুবাইরের এই তলোয়ারই মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোষ মুক্ত প্রথম তলোয়ার।

নাম যুবাইর, ডাকনাম আবূ আবদুল্লাহ্ আর উপাধি ছিলো হাওয়ারীয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)। আব্বার নাম 'আওয়াম' এবং মায়ের নাম সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব। যুবাইর (রা.)-এর মা সাফিয়া ছিলেন নবী (সা.)-এর আপন ফুফু। অর্থাৎ যুবাইর ছিলেন নবী (সা.) ফুফাত ভাই। হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন হযরত যুবাইর (রা.)–এর ফুফু। অপর দিকে হযরত আয়েশা (রা.)- এর সহোদরা প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দিকের কন্যা আসমাকে বিয়ে করায় যুবাইর ও রাসূল (সা.)-এর মধ্যে ছিল নানা আত্মীয়তার বন্ধন।

যুবইর (রা.) জন্মগ্রহণ করেন হিজরতের আটাশ বছর পূর্বে। তাঁর বাল্যকাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়না। তবে এটুকু জানা যায় যে, তাকে বীর পুরুষ, আত্মসংযমী, আত্মপ্রত্যয়ী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাঁর মা সাফিয়ার প্রচেষ্টার কোন অন্ত ছিলো না। এমন কি এজন্য তিনি যুবাইরকে প্রচণ্ড মারধোর ও শাস্তি দিতেন। একদিন তো তাঁর চাচা নওফেল বিন খুওয়াইলিদ ভীষণভাবে ক্ষেপে গিয়ে সাফিয়াকে বললেন, 'এভাবে মারতে মারতে ছেলেটাকে তুমি মেরেই ফেলবে'। এরপর

www.icsbook.info

তিনি বানূ হাশিমের লোকদের ডেকে বললেন, 'তোমরা সাফিয়াকে বুঝাওনা কেনো?' এর উত্তরে সাফিয়া বললেন, 'যারা বলে আমি তাকে দেখতে পারিনা, তারা মিথ্যা বলে। আমি তাকে এজন্য মারধোর করি যাতে সে বুদ্ধিমান হয় এবং পরবর্তী জীবনে শত্রু সৈন্য পরাজিত করে গণিমতের মাল লাভে সক্ষম হয়।'

আনন্দের কথা হলো অল্প বয়স থেকেই যুবাইর সত্যি সত্যিই পাহলোয়ান হয়ে উঠেছিলেন। অন্তত একটা ঘটনায় এর প্রমাণ মেলে, একদিন মক্কার এক বলিষ্ঠ দেহের যুবকের সাথে তার মোকাবিলা হয়। এক পর্যায়ে যুবাইর তাকে এইছা মার দিলেন যে, যুবকটির একটি হাতই ভেঙে গেলো। যুবকটির এহেন দুরবস্থা দেখে লোকেরা বিচারের জন্য তাকে নিয়ে যুবাইরের মায়ের নিকট এলো। কিন্তু আশ্চর্য! যুবাইরের মা সাফিয়া এ ঘটনায় তো মর্মাহত হলেনই না, উল্টো তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমারা যুবাইরকে কেমন দেখলে-সাহসী না ভীরু?'

মাত্র ষোল বছর বয়সেই যুবইর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। যতদূর জানা যায় তিনি প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর পরই অন্যান্যদের মতো তাঁর ওপরও অত্যাচার নির্যাতন নেমে আসে। তাঁর চাচা তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরানোর জোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে ক্ষেপে গিয়ে তাঁর ওপর নির্যাতন শুরু করেন। কখনো হোগলায় পেঁচিয়ে দড়ি বেধে নাকে ধোঁয়া দিতো। ফলে তার জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠতো। তবুও তিনি ইসলাম ত্যাগ করেননি, বরং তিনি বলতেন, 'যতো কিছুই করুননা কেন আমি আবার কাফির হতে পারিনা।'

কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথমে তিনি হাফশায় হিজরত করেন। পরে হাফশা থেকে ফিরে এসে শুনেন রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরত করেছেন। অতএব তিনিও মদীনায় হিজরত করেন।

রাসূল (সা.) অন্যান্যদেরকে যেমন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ

www.icsbook.info

করেছিলেন, তেমনি মক্কায় থাকা কালে যুবাইর (রা.) ও তালহা (রা.) -এর মধ্যে ভ্রতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেন। পরে যুবাইর (রা.) যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন রাসূল (সা.) আবার সালামা ইবন সালামা আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেন। এই সালামা (রা.) ছিলেন আকাবার বায়াত গ্রহণকারীদের অন্যতম ও মদীনার একজন সভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব।

দুঃসাহসী একজন মর্দে মুজাহিদ ছিলেন হযরত যুবাইর (রা.)। বদর যুদ্ধে তিনি অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। শত্রু পক্ষের কাছে যুবাইর নামটাই ছিল মারাত্মক ত্রাস সৃষ্টিকারী। তিনি যে সব যুদ্ধে অংগ্রহণ করেছেন সে সব ক্ষেত্রে শত্রুদের প্রতিরক্ষা ব্যুহ ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছেন । বদর যুদ্ধের দিন এক মুশরিক যোদ্ধা উঁচু টিলার ওপর উঠে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য আহবান জানালে জুবাইর দেরি না করে তাকে মুহূর্তে জাপ্টে ধরেন এবং দুজনেই গড়াতে গড়াতে নীচে আসতে থাকেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূল (সা.) বলেন, 'এদের মধ্যে যে প্রথম মাটিতে পড়বে, সে নিহত হবে।' রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হলো, মুশরিকটি প্রথমে মাটিতে পড়ে – যুবাইর দেরি না করে, তরবারির এক আঘাতে তাকে হত্যা করে।

এই একই যুদ্ধে সর্বাঙ্গে বর্মাচ্ছাদিত উবাইদা ইবন সাঈদের সাথে তাঁর মোকাবিলা হয়। উবাইদার শুধু দু'টি চোখই খোলা ছিল। যুবাইর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে চোখ তাক করে তীর ছুড়লেন, তীর চোখ ভেদ করে মাথার পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেলো। যুবাইর অনেক কষ্টে উবাইদের লাশের ওপর বসে তীরটি বের করতে সক্ষম হন। তবে তীরটি বেঁকে গিয়েছিলো। এই ঘটনাটি এতো গরুত্বপূর্ণ ছিলো যে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাসূল (সা.) নিজে তীরটি সংরক্ষণ করেন। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.) পর্যন্ত তীরটি তাঁদের নিকট ছিল। পরে হযরত ওসমান (রা.) শাহাদাত বরণ করলে হযরত যুবাইর (রা.) তীরটি নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন এবং শাহাদাত বরণ করা পর্যন্ত তা রংরক্ষণ করেন।

www.icsbook.info

বদর যুদ্ধে তিনি এতো বীর বিক্রমে লড়েছিলেন এবং তরবারি চালিয়ে ছিলেন যে, তাঁর তরবারির ধার পড়ে গিয়েছিলো। তিনি এতো মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন যে, তার শরীরে অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি হয়। একটি ক্ষত তো চিরদিনের মত স্থায়ী হয়ে যায়। এ ব্যাপারে তাঁর ছেলে উরওয়া (রা.) বলেন, 'আমরা সেই গর্তে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম।'

বদর যুদ্ধে তিনি হলুদ পাগড়ী পরা অবস্থায় ছিলেন। তাঁর এ পোশাকে দেখে রাসূল (সা.) বলেন, 'আজ ফেরেশতাগণ এ রংয়ের পোশাক পরে এসেছেন।'

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপাকের সময় রাসূল (সা.) কে কেন্দ্র করে যে জানবাজ সাহাবীরা প্রতিরোধ ব্যূহতৈরী করেছিলেন, হযরত যুবাইর (রা.) ছিলেন তাদের অন্যতম।

খন্দকের যুদ্ধে জুবাইর (রা.)-এর ওপর দায়িত্ব পড়ে যেদিককার প্রতিরক্ষার সে দিকে মহিলারা অবস্থান করছিলেন। মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বানূ কুরাইজা এ যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে। বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে জানার জন্য রাসূল (সা.) কোন একজনকে পাঠাতে চাইলেন। এ জন্য তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে তাদের সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে?' তিনবারই যুবাইর (রা.) উত্তর দেন, 'আমি।' নবী (সা.) তাঁর এহেন উত্তরে খুশি হয়ে বলেন, 'প্রত্যেক নবীরই থাকে হাওয়ারী। আমার হওয়ারী যুবাইর।'

আসলে বানূ কুরাইযা গোত্রের সংবাদ সংগ্রহ করা ছিলো খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। এ জন্য রাসূল (সা.) যুবাইরের বীরত্বে অভিভূত হয়ে বলেন, 'আমার বাপ মা তোমার নামে উৎসর্গ হোক।'

পরিখা'র যুদ্ধের পর বানূ কুরাইজার যুদ্ধ ও বাইয়াতে রিদওয়ানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। খাইবার যুদ্ধের সময় তিনি প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচয় দেন। এই যুদ্ধের ইয়াহুদী নেতা মুরাহহিব নিহত হয়। ফলে তার ভাই ইয়াসির ভয়ানক চটে গিয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে এসে দ্বন্দ্ব

www.icsbook.info

যুদ্ধের আহবান জানালো। ইয়াসিরের মোকাবিলায় যুবাইর (রা.) গিয়ে দাঁড়ান। কিন্তু ইয়াসিরের শরীর এতই তাগড়া ছিলো যে যুবাইর (রা.)-এর মা সাফিয়া ভড়কে গিয়ে বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমার সন্তান আজ শহীদ হয়ে যাবে। উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, 'না না, যুবাইর শহীদ হবে না; বরং যুবাইর ইয়াসিরকে হত্য করবে।' ফলে তাইই হলো। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর যুবাইর ইয়াসিরকে তলোয়ারের এক কোপে দুখণ্ড করে ফেললেন।

মানবিক দুর্বলতার কারণে প্রখ্যাত সাহাবা হাতিব বিন আবী বালতায়া (রা.) মক্কা অভিযানের সমস্ত খবর জানিয়ে কুরাইশদের নিকট গোপনে এক মহিলাকে চিঠিসহ পাঠান। অহীর মাধ্যমে রাসূল (সা.)–এ খবর জানতে পারেন এবং মহিলাকে গ্রেফতার করার জন্য একটি ক্ষুদ্র দল পাঠান। হযরত যুবাইর (রা.) ছিলেন এ দলের অন্যতম সদস্য ।

হিজরী আট সনে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়। মক্কা বিজয় কালে দশহাজার সৈন্য রাসূল (সা.)-এর সঙ্গী হয়। তিনি এই দশহাজার সৈন্য নানা ছোট বড় দলে ভাগ করেন। সব থেকে ক্ষুদ্র এবং শেষ দলটির সাথীহন রাসূল (সা.) নিজে। আর এ দলের সেনাপতিত্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করেন যুবাইর (রা.)। মক্কায় প্রবেশের পর শান্তি স্থাপিত হলে হযরত মিকদাদ ও যুবাইর (রা.) ঘোড়ায় চড়ে রাসূল (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা.) উঠে দাঁড়িয়ে নিজ হাতে উভয়ের মুখমণ্ডলের ধূলোবালি ঝেড়ে দিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর মদীনা ফেরার পথে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। এ যুদ্ধে যুবাইর (রা.) অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি একাকী কাফেরদের একটি গোপন ঘাটির নিকট পৌঁছে যান। তাঁকে দেখে এক ব্যক্তি সঙ্গীদেরকে বললো, 'আমাদের প্রভু লাত এবং ওয্যার কসম! ঘোড়ায় আরোহী এই লম্বা বক্তিই নিশ্চয় যুবাইর। সাবধান! প্রস্তুত হও এবং সকলে প্রস্তুত থাকো। কারণ যুবাইরের আক্রমণ অত্যন্ত মারাত্মক।' লোকটির বক্তব্য শেষ হতে না হতেই মুশরিকরা

www.icsbook.info

আকস্মিকভাবে যুবাইরকে ঘিরে ফেললো। কিন্তু যুবাইর (রা.) অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে শত্রুব্যূহ ভেদ করলেন, এমনকি একাই সেই ঘাটির মুশরিকদের পরাজিত করে ঘাটি দখল করেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফত কালে ইয়ারমুকের যুদ্ধে যুবাইর (রা.) দুঃসাহসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নিলে মুসলিম সৈন্যরা তাঁর নেতৃত্বে রোমান বাহিনীর মধ্যভাগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। হযরত যুবাইর (রা.) অত্যন্ত ক্ষীপ্রতার সাথে আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং রোমান বাহিনীর প্রতিরোধ ব্যূহভেদ করে অপর প্রান্তে পৌছে যান। কিন্তু তাঁর সংগীরা তাঁকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থা দেখে তিনি পুনরায় রোমান বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে নিজ বাহিনীর কাছে ফিরে আসেন। কিন্তু আসার সময় মারাত্মকভাবে আহত হন। এ সময় তিনি ঘাড়ে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর ছেলে উরওয়া বলেন, 'বদরের পর এটা ছিল দ্বিতীয় যখম, যার মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ছেলে বেলায় আমরা খেলতাম।' খুশির কথা হলো তাঁর এ দুঃসাহসিক আক্রমণের কারণেই রোমান বাহিনী ছত্রভঙ্গ ও পরাজিত হয়।

মিসরের ফুসতাত কিল্লা জয়ের সময় ঘটলো এক চমকপ্রদ ঘটনা। হযরত আমর ইবনুল আসের (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ফুসতাত কিল্লা সাত মাস অবরোধ করে রেখেও দখল আনতে পারছিলো না। শেষ মেষ হযরত ওমর (রা.) দশহাজার সৈন্য ও চারহাজার সেনা অফিসারকে আমর (রা.)-এর সাহায্যের জন্য পাঠালেন। তিনি লিখে পাঠালেন এ অফিসাররা এক এক জন একহাজার সৈন্যের সমান। হযরত যুবাইর (রা.) ছিলেন এ সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন। দীর্ঘ অবরোধের পরেও যখন কিল্লা জয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো না, তখন একদিন যুবাইর (রা.) বললেন, 'আজ আমি মুসলমানদের জন্য আমার জীবন কুরবান করবো।' যেই বলা সেই কাজ। যুবাইর (রা.) উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে মই লাগিয়ে কিল্লায় উঠে গেলেন। আর কিল্লায় চড়েই নারায়ে-তকবীর ধ্বনি দিতে

www.icsbook.info

শুরু করলেন, সাথে সাথে নীচে থেকে মুসলিম সৈন্যরা আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললো। এহেন ঘটনায় খৃষ্টানরা হতভম্ব হয়ে গেল এবং সন্ত্রস্তভাবে ছুটাছুটি শুরু করলো। এ সুযোগে যুবাইর (রা.) কিল্লার দরোজা খুলে দিলেন-সংগে সংগে মুসলিম বাহিনী কিল্লায় প্রবেশ করলো।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) মৃত্যু শয্যায় যে ছয় জনের ভেতর খলীফা নির্বাচন করার জন্য বলে যান হযরত যুবাইর (রা.) তাঁদের একজন।

হযরত ওসমান (রা.)-এর বাড়ি বিদ্রোহীরা ঘিরে ফেললে তাঁর ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার জন্য যুবাইর (রা.) স্বীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহকে (রা.) কে নিয়োগ করেন। হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত কালে হযরত ওসমানের শাহাদাতের ঘটনা নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। হযরত তালহা ও যুবাইর (রা.) মক্কায় গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে মিলিত হন। তারা উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং মদীনায় না গিয়ে বসরার দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রচুর লোক তাঁদের সঙ্গী হন। এদিকে হযরত আলী (রা.) এ সংবাদে তাঁদের প্রতিরোধের উদ্দ্যেশে রওনা হন এবং বসরার নিকটবর্তী 'যীকার' নামক স্থানে দুই বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নেয়। সময়টা ছিল হিজরী ৩৫ সনের ১০ই জমাদিউল উখরা। ইতিহাসে এ যুদ্ধকেই জংগে জামাল বা উটের যুদ্ধ বলে।

উভয় দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এ জন্য শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়ে শান্তি স্থাপনের কাছাকাছি পৌঁছলে, উভয় পক্ষে ঘাপটি মেরে থাকা মুনাফিকরা তাতে বাঁধ সাধলো এবং যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলো। এক পর্যায়ে হযরত আলী (রা.) একাকী যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে এসে যুবাইর (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে আবূ আবদুল্লাহ! সেই দিনের কথা তোমার মনে আছে কি? আমরা উভয়ে পরস্পরের হাতে হাত রেখে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাসূল (সা.) বলেছিলেন, 'হে যুবাইর! তুমি

www.icsbook.info

একদিন আলীর বিরুদ্ধে না হক যুদ্ধ করবে।'

উত্তরে হযরত যুবাইর (রা.) বললেন, 'হ্যাঁ তিনি বলেছিলেন। যদিও আমি তা স্মরণ রাখতে পারিনি। তবে এখন আমার মনে পড়ছে।'

হযরত আলী (রা.) আর কিছু না বলেই সেখান থেকে চলে গেলেন কিন্তু সত্যের সৈনিক যুবাইর (রা.)–এর মধ্যে বিপ্লব ঘটে গেলো। তিনি দ্রুত হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, 'আমি ভুল বুঝাবুঝির ওপর ছিলাম। হযরত আলী (রা.) আমাকে রাসূল (সা.)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।' আয়েশা (রা.) বললেন, 'এখন আপনার উদ্দেশ্য কি?' যুবাইর (রা.) উত্তরে বললেন, 'এখন আমি এ সব ঝগড়া থেকে বিরত থাকতে চাই।'

উপস্থি যুবাইর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা.) প্রশ্ন করলেন, 'তা হলে আপনি আমাদেরকে উভয় সমস্যার মধ্যে ফেলে আলী (রা.)-এর ভয়ে পালাচ্ছেন।'

উত্তরে যুবাইর (রা.) বললেন, 'আমি কসম করেছি, আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না।' 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) বললেন, 'কসমের কাফফারা দেওয়াও তো অসম্ভব কিছু নয়।' এই বলে তিনি স্বীয় গোলাম মাকহুলকে আযাদ করে দিলেন।

যুবাইর (রা.) বললেন, 'বাবা! হযরত আলী (রা.)-এর ভয়ে নয়, বরং আমার মনই একাজ করতে চাচ্ছে না। এরপর হযরত আলী রাসূল (সা.)-এর এমন এক কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। যার ফলে আমার আগ্রহ উদ্দীপনা নিস্তেজ হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে আমি অন্যায় পথে ছিলাম। আসো, তুমিও আমার সাথে যুদ্ধ বিরতি মেনে চলো।'

হযরত আবদুল্লাহ (রা.) অস্বীকার করলে তিনি বসরার দিকে রওয়ানা দিলেন। এ সময় আহনাফ বিন কায়েসের কথামত আমার বিন জারমুজ যুবাইর (রা.)-এর পিছু নেয় এবং বসরা থেকে কিছু দূরেই সশস্ত্র অবস্থায় তার সংগে মিলিত হয়। জারমুজ যুবাইর (রা.)-এর কাছে এসে বললো, 'আবূ আবদুল্লাহ। জাতিকে আপনি কি অবস্থায় ছেড়ে এলেন?' যুবাইর (রা.) বললেন, 'তারা একে অপরের গলায় ছুরি

www.icsbook.info

চালাচ্ছে।' পুনরায় ইবনে জারমুজ বললেন, 'আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। তাই এ ঝগড়া থেকে দূরে যেতে চাই' ইবনে জারমুজ বললো, 'চলুন সেদিকে আমিও যাবো।' দু'জন এক সংগে চললেন। জোহরের সময় হলে যুবাইর (রা.) থামলেন। সে সময়ে ইবন জারমুজ তাঁর সাথে সালাত আদায়ের ইরাদা পেশ করলে যুবাইর (রা.) বললেন, 'আমি তোমাকে আশ্রয় দান করছি। তুমি কি আমার সাথে সেই ব্যবহার করবে? ইবন জারমুজ বললো, 'অবশ্যই।'

এরপর উভয়ে সালাতে দাঁড়ালেন। সেজদারত হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বাসঘাতক বেঈমান ইবন জারমুজ আশারায়ে মোবাশ্‌শারার অন্যতম সদস্য নবী হাওয়ারী হযরত যুবাইর (রা.)-এর মাথা তলোয়ারের এক আঘাতে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ইন্নালিল্লাহ অইন্না ইলাহ রাজিউন।

যুবাইর (রা.) কে শহীদ করার পর নরাধম ইবন জারমুজ তার তালোয়ার লৌহবর্ম ইত্যাদি নিয়ে আলী (রা.)-এর দরবারে হাজির হয়ে গর্বের সাথে তার কৃতকার্জের বর্ণনা দিলো। হযরত আলী (রা.) সেদিকে কর্ণপাত না করে যুবাইর (রা.) তলোয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আহ্! এই সেই তলোয়ার যা দিয়ে যুবাইর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর থেকে বহুবার মুসীবতের পাহাড় হটিয়ে দিয়েছেন। হে জারমুজ! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, জাহান্নাম তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।' হযরত যুবাইর (রা.)-এর শাহাদাতের সনটি ছিল হিজরী ৩৬। শাহাদাতের পর তাঁর লাশ 'আসা সিবা' উপত্যকায় দাফন করা হয়।

হযরত যুবাইর (রা.) ছিলেন দ্বীনের ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানী একজন সাহাবী। তিনি রাসূল (সা.)-এর হাওয়ারী ও সর্বাক্ষণিক সংগী হওয়া সত্ত্বে ও খুব কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে হযরত আদুল্লাহ (রা.) জানতে চাইলে তিনি ছেলেকে উত্তর দেন' 'বেটা অন্যদের থেকে রাসূলের (সা.) সাহচর্য ও বন্ধুত্ব আমার কোন

www.icsbook.info

অংশে কম ছিলো না। যেদিন ইসলাম কবুল করেছি, সেদিন থেকে রাসূলের (সা.) সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। কিন্তু তাঁর এ সতর্কবাণী টি আমাকে দারুণভাবে সাবধান করেছে, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার আবাস ঠিক করে নেয়।'

যুবাইর (রা.) বিপদ আপদ বালা মুছীবতকে থোড়ায় কেয়ার করতেন, এমনকি মৃত্যু ভয়েও তিনি কখনো ভীত হতেন না। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর জীবনে প্রচুর উদাহরণ রেখে গেছেন। ইসকান্দারিয়া অবরোধের সময় সিঁড়ি লাগিয়ে তিনি কিল্লার ভেতর ঢুকতে চাইলে সঙ্গীরা বললেন, ভেতরে মারাত্মক প্লেগ।' জবাবে এ অকুতোভয় সৈনিক বললেন, 'আমরা তো যখম ও প্লেগের জন্যই এসেছি। সুতরাং মৃত্যু ভয় কেন? এরপর তিনি নির্ভয়ে কিল্লায় প্রবেশ করলেন।

উহুদের যুদ্ধে তাঁর মামা হযরত হামজা (রা.) শহীদ হন। এ সংবাদে তাঁর মা সাফিয়া ভাইয়ের লাশ দাফনের জন্য দু'টুকরো কাপড় পাঠান। কিন্তু মামার পাশেই তিনি একজন আনসারী ব্যক্তির লাশ দেখতে পেলেন। একটি লাশের জন্য দু'প্রস্থ কাপড় অথচ অন্যটি কাপড় বিহীন এটা তাঁর কাছে দৃষ্টিকটু মনে হলো 'তাই তিনি কাপড় দু'টি লটারীর মাধ্যমে ভাগ করলেন, যাতে পক্ষপাতিত্ব না হয়। আসলে কাপড় দু'টি ছোট বড় ছিলো-এজন্য এ সাবধানতা। এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছো ইসলামী শাসনের প্রতি তিনি কেমন অনুগত ছিলেন।

দানশীলতা, উদারতা, আমানতদারী, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণে যুবাইর (রা.) ছিলেন গুণান্বিত। যুবাইর (রা.) ছিলেন অসম্ভব একজন ধনী ব্যক্তি। তার কাছে এক হাজার গোলাম ছিলো। তারা প্রতিদিন প্রচুর আয় করতো। এ আয়ের এক পায়সাও তিনি নিজের জন্য ব্যয় করতেন না, সম্পূর্ণ অর্থই দান করে দিতেন। তিনি এতই ধনী ব্যক্তি ছিলেন যে মৃত্যুকালে তাঁর নিকট পাঁচ কোটি দুইলক্ষ দিরহামের স্থাবর সম্পত্তি ছিলো। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে তাঁর অনেকগুলি বাড়িঘরও

www.icsbook.info

ছিলো। অবশ্য তিনি বেশ ঋণীও ছিলেন। এ ঋণ ছিল আমানতকারীদের। তিনি আমানতকারীদের বলতেন, 'এ মাল আমি আমানত রাখছিনা, বরং ঋণ নিচ্ছি। এভাবে ঋণ হলে শোধ দেয়ার তাগিত জন্মাবে।'

ঋণের ব্যাপারে তিনি ছেলেকে অছিয়ত করে বলেন, 'বাবা! ঋণের প্রতি আমার মন সর্বদা চিন্তিত। তাই আমার মাল বিক্রয় করে সর্বপ্রথম আমার ঋণ পরিশোধ করো। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকে তার থেকে এক তৃতীয়াংশ শুধু তোমার সন্তানের জন্য অসিয়ত করছি। তবে যদি মাল দিয়ে সম্পূর্ণ কাজ সমাধা না হয়, তা হলে আমার মাওলার কাছে চেয়ে নিও।' আবদুল্লাহ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার মাওলা কে? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার মাওলা সেই প্রভু রাব্বুল আলামীন, যিনি আমাকে কোন রকম মুসীবতের সময়ই সাহায্য করেছেন।'

তিনি অত্যন্ত দায়িত্ববান লোক ছিলেন। অত্যধিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি পরিবার পরিজনের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। বিশেষ করে তিনি পুত্র আবদুল্লাহর (রা.) বাচ্চাদেরকে খুবই মহব্বত করতেন। তিনি নিজের ছেলেদের শিক্ষা দিক্ষার ব্যাপারেও খুবই সজাগ মানুষ ছিলেন। আবদুল্লাহর (রা.) সয়স যখন মাত্র দশবছর তখন তিনি তাঁকে যুদ্ধের বাস্তবতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য দর্শক হিসাবে ইয়ারমুকের যুদ্ধে নিয়ে যান।

ধনী হওয়া সত্ত্বেও তিনি খাওয়া দাওয়া ও পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে সাদাসিধা ছিলেন। তবে যুদ্ধের সময় তিনি রেশমী পোশাক পরতেন। রাসূল (সা.) তাঁকে বিশেষভাবে এ অনুমতি দিয়েছিলেন। আর তিনি কারুকার্য খচিত যুদ্ধাস্ত্র পছন্দ করতেন। তাঁর তালোয়ারের বাটটি ছিল রৌপ্য নির্মিত।

হযরত যুবাইর (রা.) ছিলেন একজন দক্ষ ব্যবসায়ী। আনন্দের কথা হলো তিনি জীবনে যে ব্যবসায়ে হাত দিয়েছেন, সব তাতেই তিনি প্রচুর পরিমাণে লাভবান হয়েছেন।

বহু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার কারণে তাঁর দেহ ছিলো ক্ষত বিক্ষত।

www.icsbook.info

এ ব্যাপারে আলী ইবনে খালিদ বলেন, 'আমাদের কাছে মুসেল থেকে একটি লোক এসেছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন, 'আমি যুবাইর (রা.)-এর সফর সঙ্গী ছিলাম। সফরের এক পর্যায়ে আমি তাঁর দেহে এমন সব আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলাম যা অন্য কারো দেহে আর কখনো দেখিনি।'

ব্যক্তি হিসাবে হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবাইর (রা.) কেমন ছিলেন তা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাদের দু'জনের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহর কসম, তাঁরা দু'জনই ছিলেন অত্যন্ত সংযমী, পুণ্যবান, সৎকর্মশীল, আত্মসমর্পণকারী, পুত পবিত্র, পবিত্রতা অর্জনকারী ও শাহাদাত বরণকারী।'

www.icsbook.info

হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.)

'এটা দিয়েই তোমরা আমার কাফন বানাবে। বদরের যুদ্ধে এ যুব্বাটা পরেই কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়েছিলাম। আমার ইচ্ছে আল্লাহর দরবারে এটা নিয়েই আমি উপস্থিত হই।' মৃত্যুর আগে হযরত সাদ (রা.) বহু সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও একটি পুরানো পশমী জুব্বা দেখিয়ে উপরিউক্ত অছিয়ত করে যান।

তাঁর নাম সা'দ। ডাকনাম আবূ ইসহাক। পরবর্তীতে তিনি সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস নামে পরিচিত হন। আব্বার নাম আবূ ওয়াক্কাস মালেক। মায়ের নাম হামনা। তাঁর বংশ তালিকা এ রকম–সা'দ ইবন মালেক, ইবন ওয়াহব, ইবন আবদে মোনাফ, ইবন যোহর, ইবন মুররা, ইবন কা'ব, ইবন লুওয়াই, ইবন গালেব, ইবন ফেহর, ইবন নযর, ইবন কেনানা আল-কারশী আযযোহারী। এ তথ্য মতে তিনি যোহরী গোত্রের লোক ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর মাতা আমিনাও এ যোহরী গোত্রের ছিলেন। এদিক দিয়ে হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাসূল (সা.)- এর মাতুল ছিলেন। অবশ্য রাসূল (সা.) বহু বারই একথা উল্লেখ করেছেন যে, 'সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.) আত্মীয়তার দিক দিয়ে আমার মামা হন।'

সা'দ (রা.) মাত্র ১৭ বছর বয়সে ইসলাম কবূল করেন। প্রথম খলীফা হযরত সিদ্দীকে আকবরের দাওয়াত পেয়ে সা'দ (রা.) রাসূল (সা.) নিকট হাজির হন এবং ইসলাম কবূল করেন। প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি একজন । তিনি নিজেকে তৃতীয় মুসলমান বলে দাবী করেছেন। তবে ঐতিহাসিকভাবে যেটা সত্য তা হলো তিনি ৭ম অথবা ৮ম ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমান। যাহোক তিনি

www.icsbook.info

ইসলাম গ্রহণ করেছেন এ সংবাদ তাঁর মায়ের কানে পৌঁছানো মাত্র তাঁর মা হামনা খুব হৈ চৈ ও কান্নাকাটি শুরু করে দেন। এমনকি তিনি ঘোষাণা দেন 'সা'দ যতক্ষণ মুহাম্মদের রিসালতের অস্বীকৃতি ঘোষণা না দেবে ততক্ষণ আমি কিছু খাবোনা, কিছু পান করবো না, রৌদ্র থেকে বাঁচার জন্য ছায়াতেও আসবো না। মার আনুগত্যের হুকুম তো আল্লাহও দিয়েছেন। আমার কথা না শুনলে অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে এবং মার সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

মাতৃভক্ত সা'দ তাঁর মায়ের এহেন ঘোষণায় খুব অস্থিত হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে তিনি রাসূল (সা.)-এর খেদমতে হাযির হয়ে সব ঘটনা খুলে বললেন। রাসূল (সা.) জবাব দেওয়ার পূর্বেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা আনকাবুতের ৮৯ নং আয়াতটি নাযিল করেন, 'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি ভালো ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার ওপর বল প্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে বলে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের আদেশ অমান্য করো।'

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সা'দ (রা.)–এর চিত্ত চাঞ্চল্য কমে এলো। তিনি তাঁর মাকে বার বার বুঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর মা কোন কথাই শুনলেন না–তিনদিন পর্যন্ত তিনি তার সিদ্ধান্তের ওপরে অটল থাকার পর সা'দ (রা.) বাধ্য হয়ে তাঁর মাকে জানিয়ে দিলেন, 'মা তোমার মতো হাজারো মা যদি আমার ইসলাম ত্যাগ করার জন্য জিদ ধরে পানাহার ছেড়ে দেয় এবং মৃত্যুবরণ করে, তবুও যে সত্যদ্বীনকে বুঝে শুনে গ্রহণ করেছি, তা ত্যাগ করা সম্ভব নয়।' এ সত্য কথাগুলো শুনার পর সা'দ (রা.)-এর মায়ের মন ক্রমান্বয়ে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং এক পর্যায়ে তিনি মুসলমান হন। সা'দের পিতা আবী ওয়াক্কাসও মুসলমান হয়েছিলেন।

ইসলামের প্রথম যুগে যাঁরা ইসলাম কবুল করেছিলেন তাঁরা প্রথম প্রথম গোপনে ইসলাম পালন করতেন। নবুয়াতের তৃতীয় বছরে সুলাইম গোত্রের নওমুসলিম আমর ইবন আব্বাস শিয়াবে আবূ

www.icsbook.info

তালিবের এক কোনে সালাত আদায় করছিলেন। কিন্তু কোরাইশরা এ দৃশ্য দেখে ফেলে এবং তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে হযরত সা'দসহ দু'একজন মুসলমানও এগিয়ে আসেন ও তাদের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানান। কথা কাটাকাটি হতে হতে এক পর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। এ সময় হযরত সা'দ (রা.) পাশে পড়ে থাকা উটের এক খণ্ড হাড় তুলে নিয়ে একজন কাফিরকে মনমত পিটুনী দেন। এতে লোকটির শরীর তো রক্তাক্ত হয়ই, সাথে সাথে মাথাও যায় ফেটে। সত্যি বলতে কি এটাই ছিলো ইসলামের জন্য প্রথম রক্তপাত, যা হযরত সা'দ (রা.)-এর হাতেই ঘটেছিলো।

কোরাইশদের অত্যাচারে মক্কায় টিকতে না পেরে মুসলমানরা মদীনায় হিজরত করা শুরু করলে-প্রথমে মদীনায় পৌছান মুসয়াব ইবন উমাইর ও ইবন উম্মে মাকতূম (রা.)। এরপর চারজনের একটি ক্ষুদ্র কাফেলা মদীনায় গমন করে। এদের মধ্যে ছিলেন সা'দ (রা.)। এ ব্যাপারে হযরত বারা ইবন আযিব (রা.) বলেন, 'সর্ব প্রথম আমাদের নিকট আগমন করেন মুসয়াব ইবন উমাইর ও ইবন উম্মে মাকতুম (রা.)। এ দু'ব্যক্তি মদীনা বাসীদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। অতপর বিলাল, সা'দ ও আমার বিন ইয়াসির (রা.) আগমন করেন।' অন্য এক বর্ণনা মতে জানা যায় যে সা'দ (রা.) এর সাথে তাঁর ভাই উমাইরও হিজরত করেন। জানা যায় তাঁরা মদীনায় এসে পূর্বেই মদীনায় অবস্থানকারী তাঁদের অন্য এক ভাই উতবা ইবন আবী ওয়াক্কাসের বাড়িতে উঠেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। উমাইর (রা.) প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম একজন।

মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত করার পরও কোরাইশদের আক্রমণের আশঙ্কা থেকে দূরে থাকতে পারলেন না। বরং সর্বদা তাদেরকে সচেতন থাকতে হতো কখন তারা আক্রমণ করে বসে। সে জন্য রাসূল (সা.) কোরাইশদের গতি বিধি লক্ষ্য রাখতে হযরত আবদ ইবনুল হারেসের নেতৃত্বে ষাট থেকে আশি জন অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। এ দলে হযরত সা'দ (রা.) ছিলেন। এক পর্যায়ে তারা যখন

www.icsbook.info

হেযাযের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় গিয়ে পৌঁছায় তখন একদল কোরাইশ বংশীয় মুশরিকের দেখা পান। যেহেতু মুসলমানরা শুধু অবস্থা জানার জন্য ঘুরে ফিরছিলেন তাই কোন যুদ্ধ হলো না। কিন্তু হযরত সা'দ (রা.) উত্তেজিত হয়ে মুশরিকদের লক্ষ্য করে তীর চালনা করেন। তোমরা শুনলে পুলকিত হবে যে, এ তীরই আল্লাহর রাস্তায় চালানো সর্ব প্রথম তীর।

স্বয়ং রাসূলের (সা.) নেতৃত্বে হিজরী দ্বিতীয় সনের রবিউস্‌সানী মাসে কোরাইশদের গতি বিধি লক্ষ্য রাখতে দুশো সাহাবীর একটি দল মদীনা থেকে বের হন। এ দলের পতাকাবাহী ছিলেন হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্‌কাস (রা.)। এবার বাওয়াত নামক স্থানে ছোট ধরনের একটি সংঘর্ষ হয়।

রাসূল (সা.) বদর যুদ্ধের দু'একদিন আগে কুরাইশদের অবস্থা জানার জন্য যে ক্ষুদ্র দলটি প্রেরণ করেন হযরত সা'দ (রা.) তাঁদের মধ্যে ছিলেন। দলটি ক্ষুদ্র হলেও এরা কুরাইশদের দু'জন চরকে গ্রেফতার করে রাসূল (সা.)-এর কাছে আনেন। রাসূল (সা.) গুপ্তচরদ্বয়ের নিকট হতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধ হচ্ছে বদরেরর যুদ্ধ। এ যুদ্ধে হযরত সা'দ (রা.) ও তাঁর ভাই হযরত উমাইর (রা.) অসম্ভব সাহসিকতার সাথে লড়াই করেন। হযরত উমাইর (রা.) এ যুদ্ধে শহীদ হন। হযরত সা'দ (রা.) সরদার সাঈদ ইবনুল আসকে হত্যা করেন। সাঈদের একটি চমৎকার তরবারি ছিলো, যা হযরত সা'দ (রা.)-এর পছন্দ হয়। যুদ্ধের পর তরবারি খানা তিনি রাসূল (রা.)-এর নিকটা আনেন এবং নিজে পাওয়ার আকাংখা পেশ করেন। কিন্তু তখনও গণিমতের মাল সম্পর্কে আল্লাহর কোন নির্দেশ না আসাতে সা'দ কে বিমুখ হতে হয়। হযরত সা'দ (রা.) ফিরে যেতে যেতে সূরা আনফাল নাযিল হয়। সাথে সাথে রাসূল (রা.) সা'দকে ডেকে বললেন, 'তোমার তলোয়ার নিয়ে যাও।'

ওহুদের যুদ্ধের সেই বিভিষীকাময় পরিস্থিতিতে যে সমস্ত সৈনিক

www.icsbook.info

সাহাবা নবীজীকে হেফাজত করার জন্য তাঁকে ঘিরে ব্যূহ রচনা করেছিলেন, নিজেদের জানকে বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলেন, হযরত সা'দ (রা.) ছিলেন তাঁদেরই একজন। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেছেন।

'ওহুদের দিন রাসূল (সা.) তাঁর তূণীর আমার সামনে ছড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তীর মারো! আরও মারো। আমার মা বাবা তোমার প্রতি কুরবান হোক।'

ওহুদের যুদ্ধে সা'দ (রা.)-এর ভাই হযরত উমাইর শহীদ হলেও অপর ভাই পাপিষ্ঠ উতবার ছুড়ে দেওয়া পাথরের আঘাতেই মহানবীর মুখমণ্ডল আহত হয়। এমন কি দাঁত শহীদ হয়। তারপর থেকে সা'দ (রা.) প্রায়ই বলতেন, 'কাফিরদের অন্য কাউকে হত্যার এত প্রবল আকাঙ্খা আমার ছিল না, যেমন ছিলো উতবার ব্যাপারে। কিন্তু যখন আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনলাম, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের (সা.) চেহারা রক্ত রঞ্জিত করেছে, তার ওপর আল্লাহর গজব আপতিত হবে, তখন তার হত্যার আকাঙ্খা আমার নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং অন্তরে প্রশান্তি নেমে আসে।'

ওহুদের যুদ্ধের ঐ বিপদের মধ্যেও একটি দৃশ্য দেখে রাসূল (সা.) হেসেছিলেন। জনৈক মুশরিক বীরবিক্রমে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালাছিলো। এক সময়ে রাসূল (সা.) সা'দ (রা.) কে পাল্টা আক্রমণের হুকুম দিলেন, কিন্তু এ সময়ে একটি অকেজো তীর ছাড়া সা'দের নিকট আর কিছুই ছিলো না। অগত্যা ঐ তীর দিয়েই সা'দ (রা.) মুশরিক কে আক্রমণ করলেন। সা'দ (রা.)-এর নিশানা ছিল অব্যর্থ। তীরটি মুশরিক সৈনিকটির কপালে বিদ্ধ হতেই সে ভীষণভাবে দিশেহারা হয়ে উলঙ্গ অবস্থায় নীচে পড়ে গেলো। এ অবস্থা দেখেই রাসূল (সা.) হেসেছিলেন।

বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সব যুদ্ধ গুলোতেই অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সা'দ (রা.) অংশ গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন, তায়েফ ও তাবুকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।

www.icsbook.info

হযরত সা'দ (রা.) নিজের জীবনের চেয়ে নবী (সা.)-এর ভালমন্দের প্রতি গুরুত্ব দিতেন বেশী। খন্দকের যুদ্ধের সময় সালা পর্বতের উপত্যকার এক তাবুতে রাসূল (সা.) অবস্থান করছিলেন। কোন এক রাতে ভীষণ ঠান্ডা পড়তে থাকে, এমন সময় রাসূল (সা.) অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর এলো, 'সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস।' কি ব্যাপার! কেনো এসেছে? বললেন, 'সা'দের হাজার জীবন অপেক্ষা আল্লাহর রাসূল (সা.) হচ্ছেন তার প্রিয়তম। এ অন্ধকার ঠান্ডা রাতে আপনার ব্যাপারে আমার ভয় হলো। তাই পাহারার জন্য হাজির হয়েছি।' রাসূল (সা.) বললেন, 'সা'দ আমার চোখ খোলা ছিলো। আমি আশা করছিলাম আজ যদি কোন নেক্কার বান্দা আমার হিফাজত করতো।'

রাসূল (সা.) বিভিন্ন সময়ে হযরত সা'দ (রা.)-এর জন্য দোয়া করেছেন। বিদায় হজ্বের সময়ে তিনি দারুণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এমনকি জীবনের আশংকা করছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) একদিন তাঁর কপালে, বুকে ও পেটে হাত বুলিয়ে এ দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি সা'দকে শিফা দান করুন, তাঁর হিজরতকে পূর্ণতা দান করুন।' অর্থাৎ হিজরতের স্থান মদীনাতেই তাঁর মৃত্যু দান করুন।

আবূ ওবাইদা ও মুসান্নার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী পারস্যের কিসরা বাহিনীকে পরাজিত করে ইরাক দখল করে নিলে কিসরা বাহিনী মহাবীর রুস্তমের নেতৃত্বে পুনরায় একত্রিত হয়ে মুসলমানদের ওপর আঘাত হানার প্রস্তুতি নেয়। হযরত ওমর (রা.) এ সংবাদ পেয়ে নিজেই মুসান্নাকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন কিন্তু মজলিসে শূরা খলীফার সিদ্ধান্ত অনুমোদন না করায় সর্বসম্মতিক্রমে হযরত সা'দ (রা.) কে সেনাপতি করে পাঠান হয়। সা'দ (রা.)-এর রণকৌশল এত নিপূণ ছিলো যে, এ যুদ্ধে বিশাল পারস্য বাহিনী সর্বদিক থেকে ভীষণভাবে নাকানী চুবানী খায় এবং মুসলিম বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়।

মুসলিম বাহিনী যখন পারস্য বাহিনীকে এক এক করে পরাস্ত

www.icsbook.info

করছিলো তখন সা'দ (রা.)-এর নিকট খবর আসলো শাহানশাহ ইয়াজদিগিরদ রাজধানী থেকে মূল্যবান সমস্ত সম্পদ সরিয়ে নিচ্ছেন। এ সংবাদে দেরী না করে সা'দ (রা.) মাদায়েনের নিকে রওনা হলেন। কিন্তু ইরানীরা পূর্বেই দজলা নদীর পুলটি ধ্বংস করে দিয়েছিলো। এখানে এসে মুসলিম বাহিনী থমকে দাঁড়ালো। এ সময়ে সা'দ (রা.) সৈন্য বাহিনীর উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। ভাষণ শেষ করেই তিনি নিজের ঘোড়াসহ উত্তাল দজলা মাঝে নেমে পড়েন, দেখাদেখি মুসলিম বাহিনীও তাঁর অনুসরণ করে। তাঁরা নদী পার হয়ে ওপারে উঠলে-ইরানী বাহিনী এ দৃশ্য দেখে ভয়ে চিৎকার করতে লাগলো, 'দৈত্য আসছে, দানব আসছে, পালাও পালাও।'

সা'দবাহিনীর এ আকস্মিক আক্রমণে বাদশাহ সমস্ত ধন সম্পদ ফেলে হালওয়ানে পালিয়ে গেলো। সা'দ (রা.) রাজপ্রসাদে প্রবেশ করে আল্লাহর শোকর আদায় করার উদ্দেশ্যে আট রাকাত সালাতুল ফাতহ আদায় করলেন। ঐদিন ছিলো শুক্রবার, তাই সা'দ (রা.) বললেন, 'আজ এ প্রাসাদেই জুম'আর সালাত আদায় করা হবে।' সেই অনুযায়ী মিম্বর তৈরী করে সত্যি সত্যিই জুম'আর সালাত অনুষ্ঠিত হয়। এটাই পারস্যের মাটিতে প্রথম জুম'আর সালাত। পরবর্তীতে হযরত সা'দ (রা.) পারস্যের মাটিতে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি কুফার গভর্নরও হয়েছিলেন।

হযরত ওসমান যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হন তখন সা'দই (রা.) তাঁকে রক্ষার জন্য সর্ব প্রথম এগিয়ে আসেন। হযরত ওসমান (রা.) শহীদ হওয়ার পর যে বিশৃংখলা দেখা দেয় সা'দ (রা.) নিজেকে তা থেকে দূরে রাখেন। তিনি সিফফিন ও জংগে জামাল কোনো যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেননি। আসলে তিনি ছিলেন অসম্ভব শান্তিপ্রিয় মানুষ। এমন কি একবার তিনি তাঁর পুত্রকে আসতে দেখে বললেন আল্লাহ এ অশ্বারোহীর অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করুন। ছেলে যখন এসে বললো, 'আপনি উট ও ছাগলের মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন, অথচ এদিকে লোকেরা রাষ্ট্রীয় ঝগড়ায় লিপ্ত।' সা'দ (রা.) পুত্র উমার (রা.)-এর বুকে

www.icsbook.info

হাত রেখে বললেন, 'চুপ করো, আমি রাসূলকে (সা.) বলতে শুনেছি, আল্লাহ ভালবাসেন নির্জনবাসী, মুত্তাকী এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যে মানুষের রাগবিরাগের পরোয়া করে না তাকে।'

পঁচাশি বছর বয়সে মদীনা থেকে দশমাইল দূরবর্তী আকীক উপত্যকায় তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালটা ছিল হিজরী ৫৫ সন। মদীনার সে সময়কার গভর্নর মারওয়ান তাঁর নামাযে জানাজা পড়ান। মৃত্যুকালে হযরত সা'দ (রা.)-এর অছিয়ত মুতাবেক বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকালীন পরিহিত পুরানো জুব্বাটি দিয়েই তাঁর কাফন তৈরী করা হয়। যা প্রথমেই উল্লেখ করেছি।

হযরত সা'দ (রা.)-এর নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস এতো গভীর ছিলো যে, মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর পুত্র মুসয়াবের চোখে পানি দেখে তিনি বললেন, 'আমার জন্য কেঁদোনা। আল্লাহ কক্ষণো আমাকে শাস্তি দেবেন না, আমি জান্নাতবাসী। আল্লাহ মু'মিনদেরকে তাদের সৎকাজের প্রতিদান দেবেন এবং কাফিরদের সৎকাজের বিনিময়ে তাদের শাস্তি লাঘব করবেন।'

হযরত সা'দ (রা.) অত্যন্ত মর্যাদাবান একজন সাহাবা ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদাসহ অন্যান্য সাহাবারাও তাকে অত্যন্ত সমীহ করে চলতেন। একবার একটি হাদীসের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-এর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ তাঁর আব্বার কাছে জানতে চাইলে, পিতা ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন হাদীসটি হযরত সা'দ (রা.) বর্ণনা করেছেন কি না, আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, 'হা'। তখন ওমর (রা.) বললেন, 'সা'দ যখন তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করেন তখন সে সম্পর্কে কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করবে না।'

বিলাল (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে তিন বার হযরত সা'দ (রা.) আযান দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এমনকি রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন,'বিলালকে আমার সাথে না দেখলে তুমি আযান দেবে।'

প্রভূত সম্পদের মালিক হযরত সা'দ (রা.) অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। অবশ্য প্রথম জীবনে তিনি দরিদ্র লোক ছিলেন।

www.icsbook.info

তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমরা রাসূল (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতাম, অথচ তখন গাছের পাতা ছাড়া আমাদের খাওয়ার কিছুই থাকতো না। গাছের পাতা খাওয়ার ফলে আমাদের বিষ্ঠা হতো উট ছাগলের বিষ্ঠার মতো।' কাব্য সাহিত্যের প্রতি হযরত সা'দ (রা.)-এর প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিলো। তিনি কবিতা রচনা করেছেন বলেও প্রমাণ মিলে। প্রাচীন বই পত্রে তাঁর কিছু কবিতা সংকলিত পাওয়া যায়।

এ অসম্ভব প্রতিভাধর ঈমানদার বুজর্গ সাহাবী ছিলেন ঐ সৌভাগ্যবান দশজন সাহাবীর একজন যাঁরা জীবিত থাকতেই বেহেশ্‌তের খোশ খবর পেয়েছিলেন।

www.icsbook.info

হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রাঁ.)

নাম আবদু আমর বা আবদু কা'বা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা.) তাঁর নতুন নামকরণ করেন আবদুর রহমান। ডাক নাম আবূ মুহাম্মদ। আব্বার নাম আওফ এবং মার নাম শেফা। আব্বা মা উভয়েই যোহরী গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর দাদা ও নানা উভয়েরই নাম ছিল আওফ। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ–আবদুর রহমান ইবন আওফ, ইবন আবদু আওফ, ইবন আবদ, ইবনুল হারেস, ইবন যোহারা, ইবন কেলাব, ইবন মুরারা আল-কারশী আযযোহরী।

জানা যায় তিনি আমূল ফীল বা হস্তী বছরের দশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। এ হিসাবে আবদুর রহমান রাসূল (সা.)-এর দশ বছরের ছোট ছিলেন। কারণ রাসূল (সা.) আমূল ফীলের ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর জন্মগ্রহণ করেন। আর রাসূল (সা.) যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছরের কিছু বেশী ছিলো।

মক্কার বিশিষ্ট কিছু লোক নিয়মিত হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বাড়িতে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। হযরত আবদুর রহমান ছিলেন তাদেরই একজন। এখান থেকেই হযরত আবূ বকরের দাওয়াতে তিনি রাসূল (সা.)–এর দেখমতে হাজির হন এবং ইসলাম কবূল করেন। এ সময় রাসূল (সা.) আরকাম ইবন আবূ আরকামের ঘরে অবস্থান করছিলেন। আবদুর রহমান সেই সব সৌভাগ্যবানদেরই একজন যাঁরা প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবূ বকরের বাড়িতে যাঁরা নিয়মিত মিলিত হতেন ইতিহাসে তাদের পাঁচ জনের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন, হযরত ওসমান (রা.), হযরত সা'দ (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবাইর (রা.) ও হযরত আবদুর রহমান (রা.)। আনন্দের খবর হলো এ পাঁচ জনই আবূ বকর

www.icsbook.info

(রা.)-এর দাওয়াতে প্রথম পর্যায়ে ইসলাম কবুল করেন এবং দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হন।

নবুওয়তের প্রথম পর্বে যাঁরা ইসলাম কবূল করেছিলেন তাঁদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন নেমে আসলে নবুওয়তের পঞ্চম বছরে এগারোজন পুরুষ ও চারজন মহিলা মক্কা থেকে হাবশায় হিজরত করেন। ইসলামের ইতিহাসে হিজরত কারী এ প্রথম কাফিলাটিতে হযরত আবদুর রহমান (রা.) ছিলেন। পরে রাসূল (সা.) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন আবদুর রহমানও মদীনায় হিজরত করেন। এজন্য তাঁকে সাহিবুল হিজরাতাইন' বা দু'হিজরতের অধিকারী বলা হয়। মদীনায় হিজরতের পর রাসূল (সা.) হযরত আবদুর হরমানের সাথে হযরত সা'দ ইবনুর রাবী (রা.)-এর ভাই সম্পর্ক পাতিয়ে দেন। এরপর একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ঘটে-সা'দ (রা.) আবদুর রহমান (রা.) কে বললেন, আনসারদের সকলে জানে আমি একজন ধন্যাঢ্য ব্যক্তি। আমি আমার সকল সম্পদ সমান দু'ভাগে ভাগ করে দিতে চাই। আমার দু'জন স্ত্রীও আছেন। আমি চাই আপনি তাদের দু'জনকে দেখে একজনকে পছন্দ করুন। আমি তাকে তালাক দেবো। তারপর আপনি তাকে বিয়ে করে নেবেন। উত্তরে আবদুর রহমান বললেন, 'আল্লাহ আপনার পরিজনের মধ্যে বরকত ও কল্যাণ দান করুন। ভাই, এসব কোন কিছুর প্রয়োজন আমার নেই। আমাকে শুধু বাজারের পথটি দেখিয়ে দিন।' হযরত আবদুর রহমানকে নিকটস্থ কাইনুকা বাজারে পৌঁছে দিলে ঐ দিনই তিনি ঘি ও পণীরের ব্যবসা শুরু করেন এবং কিছুটা লাভবান হন। পরদিন থেকে তিনি রীতিমত ব্যবসা শুরু করেন।

তোমারা নিশ্চয়ই হযরত সাদ (রা.) ইসলামী ভ্রাতৃত্বের যে মর্যাদা দিয়েছে তাতে মুগ্ধ হয়েছো। অপরদিকে হযরত আবদুর রহমানও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন তা অনুসরণ যোগ্য। আসলে ইসলামের শিক্ষায় এমন।

ব্যবসা শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই হযরত আবদুর রহমানের হাতে বেশ পয়সা জমা হয়। তখন তিনি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে

www.icsbook.info

করেন। বিয়ের পরপরই তিনি একদিন রাসূল (সা.)-এর দরবারে হাজির হন তখন তাঁর কাপড়ে হলুদের দাগ ছিলো। তা দেখে রাসূল (সা.) বললেন, 'মোহর কত নির্ধারণ করেছো?' তিনি বললেন, 'খেজুরের একটি দানা পরিমাণ সোনা'। এরপর রাসূল (সা.) বললেন, 'তা হলে ওলীমার ব্যবস্থা করো। বেশী না হয় অন্তত একটা ছাগল দিয়ে হোক।'

পরবর্তীতে তাঁর হাতে যখন ব্যবসা থেকে আরো কিছু নগদ টাকা আসে তখন তিনি ওলীমার ব্যবস্থা করেন। তিনি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে দ্রুত সাফল্য লাভ করতে থাকেন। এসময়ে উমাইয়া ইবন খালফ নামক মক্কার এক ব্যক্তির সাথে তিনি একটি ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদন করেন।

হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবদুর রহমান বদর সহ প্রায় সকল যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেন এবং সকল যুদ্ধেই তিনি একজন দুঃসাহসিক যোদ্ধা হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হন। বদরের যুদ্ধ চলাকালে হযরত আবদুর রহমান হঠাৎ করে নিজেকে দু'জন কিশোরের ভেতরে দেখতে পান। তিনি এসময় নিজেকে কিছুটা অসহায় মনে করছিলেন, এমন সময় তাদের একজন এসে তাকে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'চাচা আপনি কি জানেন আবূ জেহেল কোন দিকে? জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাতিজা, তাকে খুঁজছো কেনো?' ছেলেটি বললো, 'আমি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছি, হয় তাকে কতল করবো, না হয় এজন্য জীবন দেবো।' অন্যজনও একই কথা জানালো। এরপর আবদুর রহমান (রা.) বলেন, 'তাদের কথা শোনার পর আমি খুশি হলাম। ভাবলাম কতো মহৎ দু'জন কিশোরের মাঝেখানেই না দাঁড়িয়ে আছি। ইশারা করে আমি আবূ জেহেলকে দেখানো মাত্র দু'জন কিশোর তরবারি উন্মুক্ত করে বাজপাখির মতো আবূ জেহেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁকে ধরাশায়ী করে হত্যা করেন।' এ দু'জন কিশোর কারা ছিলেন জানো? এরা ছিলেন আফরার দু'পুত্র হযরত মুয়ায (রা.) ও হযরত মায়ায (রা.)। ইসলাম

www.icsbook.info

ও মুসলমানদের সব থেকে বড় শত্রু আবূ জেহেলকে হত্যা করে এঁরা ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ওহুদের যুদ্ধে হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফের ভূমিকা ছিলো চোখে পড়ার মতো। উবাই ইবন খালফ নামক এক নরাধম রাসূল (সা.) কে হত্যা করার জন্য এগিয়ে এলে আবদুর রহমান তাকে কতল করার জন্য এগিয়ে যান কিন্তু রসূল (সা.) আবদুর রহমানকে থামিয়ে দেন। পরে রাসূল (সা.) নিজেই হারিসের বর্শাটি নিয়ে উবাই ইবন খালফ কে লক্ষ্য করে সেটি ছুড়ে দেন। এতে উবাই আহত হয়ে চেচাতে চেচাতে পালিয়ে যায় এবং সারফ নামক স্থানে মারা য়ায়। এ যুদ্ধে আবদুর রহমান মারাত্মকভাবে আহত হন। তাঁর সারা দেহে একত্রিশটি আঘাত পান। সবচেয়ে পায়ের আঘাত ছিল মারাত্মক। যার জন্য সুস্থ হওয়ার পর তিনি খোঁড়া হয়ে যান। মানে পরবর্তী জীবন তিনি খোঁড়ায়ে খোঁড়ায়ে হেটেছেন।

মদীনা থেকে প্রায় তিনশো মাইল দূরে দুমাতুল জান্দালে ষাট হিজরী সনে রাসূল (সা.) হযরত আবদুর রহমানের নেতৃত্বে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। অভিযানে রওয়ানা হওয়ার আগে আবদুর রহমান রাসূল (সা.)-এর নিকট এলে তিনি আবদুর রহমানের মাথার পাগড়িটি নিজ হাতে খুলে রেখে দিলেন এবং অপর একটি কালো পাগড়ি তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন। এরপর ইসলামী পতাকা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, 'বিসমিল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় রওয়ানা হও। যারা আল্লাহর নাফরমানী করে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো। কিন্তু কাউকে ধোকা দিও না, ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে মেরো না। এমন কি, দুমাতুল জান্দাল পৌছে কলব গোত্রের লোকজনকেই প্রথমে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিবে। তারা যদি খুশি মনে তোমাদের দাওয়াত গ্রহণ করে, তা'হলে তাদের রাজ কন্যাকে বিয়ে করবে। অন্যথায় যুদ্ধ করবে।'

জানা যায় হযরত আবদুর রহমান সেখানে পৌছানোর পর একাধারে তিন দিন তাবলীগের কাজ করার পর কলবগোত্রের সরদার আসবাগ ইবন আমর আল কলবী তার বিপুল সংখ্যক সংগী সাথীসহ

www.icsbook.info

ইসলাম কবূল করেন। পরে তিনি ঐ সর্দারের কন্যা তামজুরকে বিয়ে করেন। এই তামজুরের গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন হযরত আবূ সালমা ইবনে আবদুর রাহমান (রা.)।

মক্কা অভিযান কালে রাসূল (সা.) যে ছোট্ট কাফেলাটির সাথে ছিলেন, হযরত আবদুর রহমানও (রা.) সে দলে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর বানূ খুজাইমা গোত্রের লোকজনের কাছে দাওয়াতী কাজের জন্য হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে পাঠালে বানূ খুজাইমা ও খালিদের সাথে ভুলবুঝাবুঝি হয় এবং এক পর্যায়ে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে বানূ খুজাইমার বেশ কিছু লোক নিহত হয়।

বানূ খুজাইমার এ দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে খালিদ ও আবদুর রহমানের মধ্যে বচসা হয়। এ সংবাদে রাসূল (সা.) খালিদ ইবন ওয়ালিদকে ডেকে বলেন, 'তুমি সাবোনে আওয়ারীন (প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী) একজন সাহাবীর সাথে ঝগড়া ও তর্ক করেছো। এমনটি করা তোমার শোভন হয়নি। আল্লাহর কসম, যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনার মালিকও তুমি হও এবং তার সবই আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দাও তবুও তুমি আমার সে সব প্রবীণ সাহাবীর একজনেরও সমকক্ষ হতে পারবে না।' বুঝতেই পারছো হযরত আবদুর রহমান কোন পর্যায়ে মানুষ ছিলেন।

তাবুক অভিযানকালে মুসলমানরা ঈমানী পারীক্ষার সম্মুখীন হন। আবদুর রহমান এ পরীক্ষায় অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে উত্তীর্ণ হন। এ যুদ্ধের খরচ বহনের জন্য রাসূল (সা.) সাহায্য চাইলে আবূ বকর, ওসমান ও আবদুর রহমান প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। হযরত আবদুর রহমান তো আটহাজার দিনার নবী (সা.)-এর হাতে তুলে দেন। এ দৃশ্য দেখে মুনাফিকরা রীতিমতো কানাকানি করতে থাকে যে, 'সে মানুষ দেখানোর জন্য এ অর্থ দান করেছে। তাদের এহেন মিথ্যা অভিযোগের জবাব স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা তওবার ৭১ নং আয়াত এভাবে দিয়েছেন- 'এ তো সেই ব্যক্তি যার ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হতে থাকবে।'

www.icsbook.info

হযরত আবূ বকর (রা.) মৃত্যু শয্যায় থাকা কালে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে অনেকের সাথে পরামর্শ করেন। এক পর্যায়ে হযরত আবদুর রহমানের সাথে পরামর্শ করেন এবং হযরত ওমরের (রা.) নাম পেশ করেন। আবদুর রহমান (রা.) সব কথা শোনার পর বলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই। তবে স্বভাবগত ভাবেই তিনি একটু কঠোর।' যে আট জন সাহাবী হযরত আবূ বকরের খেলাফত কালে ফতোয়া ও বিচারের দায়িত্ব পালন করতেন তাঁর মধ্যে আবদুর রহমানও একজন। জ্ঞান ও বিচক্ষণতার দিক দিয়ে আবদুর রহমান ছিলেন শীর্ষে। তিনি ফীকাহ বিষয়ক একজন মহান পণ্ডিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, 'যারা কুরআন বুঝতে চায়, তারা উবাই বিন কাব, যারা ফারায়েজ সম্পর্কে জানতে চায়, তারা যায়িদ বিন সাবিত এবং যারা ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চায়, তারা মুয়ায বিন জাবাল ও আবদুর রহমান বিন আওফের সাথে যেনো সম্পর্ক গড়ে তোলে।' বলা যায় আবদুর রহমান (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর সার্বক্ষণিক উপদেষ্টা ছিলেন। প্রায়ই ওমর (রা.) যখন জনগণের খোঁজ খবর নেবার জন্য বের হতেন আবদুর রহমান থাকতেন তাঁর সংগী।

হযরত ওমর (রা.) নামাযে ইমামতি করা অবস্থায় যেদিন ফিরোজ নামক জনৈক অগ্নিপূজক কর্তৃক আহত হন, সেদিন তিনি বাকী নামায পড়ানোর জন্য হযরত আবদুর রহমানকে দায়িত্ব দেন। অবশ্য রাসূল (সা.) জীবিত থাকা অবস্থায় একদিন তিনি প্রাকৃতিক কাজে বাইরে গেলে হযরত আবদুর রহমানের ইমামতিতে নামায শুরু হয়। রাসূল (সা.) ফিরে এসে আবদুর রহমানের পেছনে এক্তেদা করেন।

আবদুর রহমানের বিচক্ষণতার জন্য তার সিদ্ধান্তের কারণে অনেক বড় বড় দুর্ঘটনা থেকেও মুসলিম সমাজ রক্ষা পেয়েছে, যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। এমন কি হযরত ওমর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর খলীফা নির্বাচন নিয়ে জটিলতা দেখা দিলে হযরত আবদুর রহমান এ মামলার মীমাংসা করেন। জীবিতাবস্থায় ওমর (রা.) পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের

www.icsbook.info

জন্য ছয়জনের একটি প্যানেল ঘোষণা করেন। এর মধ্যে জনগণ তিনজনের ব্যাপারে কোন সমর্থন না দিলে হযরত আবদুর রহমান বলেন, প্রশ্নটা ছয়জনের মধ্যেই সীমিত। যেই তিনজন সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কারও সমর্থন পাওয়া যায় নি, তাদেরকে আমারা বাদ দিয়ে অপর তিনজন সম্পর্কে আলোচনা করি এতে বিতর্ক অনেক কমে যাবে। এরপর যুবাইর (রা.), হযরত আলী (রা.), তালহা (রা.) ওসমান (রা.), সা'দ (রা.) এবং আবদুর রহমান (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেন।

এ প্রস্তাব শোনার পর হযরত আবদুর রহমান বললেন, 'এখন দেখছি যে, আমাদের এ তিন জনের মধ্যেই যে কোন একজন খলীফা নির্বাচিত হবে। আমি এ কাজটি আরো সহজ করে দিচ্ছি। আমি নিজে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করছি। এবার শুধু আপনাদের দু'জনের মধ্যে বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকলো।' এরপর তিনি উভয়ের সাথে আলাপ আলোচনা করে হযরত ওসমান (রা.)–এর হাতে নিজেই সর্ব প্রথম বাইয়াত হন।

হযরত ওমর (রা.), এর খিলাফতের প্রথম বছরে আবদুর রহমানকে আমীরুল হজ্ব নিযুক্ত করেন। হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে হযরত আবদুর রহমান নিজেকে গুটিয়ে নেন। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার কোন কাজে আর উৎসাহবোধ করেননি, একান্ত নীরব জীবন যাপন করেন। এ অবস্থায় হিজরী ৩২ সনে ৭৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর লাশ মদীনায় জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার জানাযার সময় প্রখ্যাত সাহাবীরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময়ে হযরত আলী বলেন, 'হে আবদুর রহমান ইবন আওফ। তুমি আল্লাহর কাছে যাচ্ছো। তুমি দুনিয়ার পরিষ্কার পানি পেয়েছো এবং ঘোলা আর দূষিত পানি ছেড়ে গেছো।'হযরত সা'দ (রা.) বলেন, 'ওয়া জাবালাহ!' অর্থাৎ এই পর্বতটিও আজ আমাদেরকে ছেড়ে চললো। তাঁর জানাযার নামায পড়ান আমীরুল মোমেনীন হযরত ওসমান গণী (রা.)।

www.icsbook.info

হযরত আবদুর রহামানের দিলে ছিলো প্রচণ্ড খোদাভীতি। তিনি সব সময়েই খোদার ভয়ে ভীত থাকতেন। এবং কান্নাকাটি করতেন। আর রাসূল (সা.)-এর প্রতি ছিলো তার অগাধ প্রেম ও ভালবাসা। এ প্রেম এতটা ছিলো যে একবার তিনি নওফেল ইবনে আয়াস (রা.) কে নিয়ে খেতে বসে খাবারের মধ্যে আটার রুটি ও গোশত দেখে কানতে শুরু করলেন। কান্নার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'রাসূল (সা.) আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু সারাটা জীবন তিনি ও তাঁর পরিবার পেট ভরে যবের রুটিও খেতে পারিনি। এখন দেখছি যে, আমরা বহু কিছু খাচ্ছি। তাই আমার মনে হচ্ছে, রাসূল (সা.)-এরপর এতদিন ধরে জীবিত থাকা আমাদের জন্য ঠিক হয়নি।'

হযরত আবদুর রহমান (রা.) সততার ক্ষেত্রে ছিলেন এক মাইল ফলক। এ সম্পর্কে হযরত ওসমান গণী (রা.) বলেন, 'আবদুর রহমান নিজের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়ার অধিকারী। অর্থাৎ তিনি যা বলেন তা তাঁর নিজের স্বার্থের পক্ষেই হোক আর বিপক্ষেই হোক, তার জন্য কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। বরং তিনি যাই বলেন তাই ঠিক।'

আবদুর রহমান উম্মাহাতুল মোমেনীনের খেদমত করার গৌরব অর্জন করেন। তিনি সব সময় তাঁদের সফর সঙ্গী হতেন। তিনি তাদের পর্দা, যান বাহন এবং অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থাও করতেন। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) এরশাদ করেছিলেন, 'আমার পর যে ব্যক্তি আমার পরিবারের রক্ষণা বেক্ষণ করবে সে ব্যক্তি অত্যন্ত সত্যবাদী এবং নেককার হবে।'

দান দক্ষিণার ক্ষেত্রে হযরত আবদুর রহমানের ভূমিকা কিংবদন্তী হয়ে আছে। যে আবদুর রহমান শূন্য হাতে মদীনায় ব্যবসা শুরু করেছিলেন তিনি পরবর্তীকালে নিজগুণে ও আল্লাহর মেহেরবানীতে প্রভূত অর্থের মালিক হন। তিনি সর্বদা এই ভয়ে ভীত থাকতেন যে তার মাল সম্পদ অর্থ কড়িই বুঝি তাকে বিপদে ফেলবে। এ জন্য তিনি সব সময় দুহাতে দান খয়রাত করতেন। একবার তো মদীনায় ঢি ঢি

www.icsbook.info

পড়ে গেলো, সিরিয়া থেকে একটি কাফেলা প্রচুর খাদ্য সামগ্রীসহ উপস্থিত হয়েছে। শুধু উট আর উট। এ কাফেলাটি ছিলো আবদুর রহমানের । এ কাফেলায় ছিলো পাঁচশো মতান্তরে সাতশো উট। জানা যায় উটসহ হযরত আবদুর রহমান পুরা বাণিজ্য কাফেলায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে দেন।

এতকিছু দান করার পরও তিনি ছিলেন অঢেল অর্থের মালিক। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আল্লাহ পাক আমার ব্যবসায় এতই রহমত দান করেছেন যে, আমি যদি কোন স্থান থেকে একটি পাথর উঠিয়ে নেই, তবুও তার নীচে স্বর্ণ পাওয়া যায়।'

হযরত আবদুর রহমান (রা.) সবার কাছে এত গ্রহণীয় ব্যক্তি ছিলেন যে, হযরত আলী (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, 'আবদুর রহমান আসমান ও যমীনের বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তি।' সবথেকে বড় কথা হলো হযরত আবদুর রহমান (রা.) ছিলেন সেই দশজন সাহাবীর একজন, যাঁরা কিনা দুনিয়াতেই বেহেশ্‌তের সুসংবাদ পেয়েছিলেন।

www.icsbook.info

হযরত তালহা ইবন ওবায়দুল্লাহ্ (রা.)

ওহুদ যুদ্ধে হযরত তালহার ভূমিকার কারণে রাসূল (সা.) বলেছিলেন, 'কেউ যদি কোন মৃত ব্যক্তিকে দুনিয়ায় হেঁটে বেড়াতে দেখে আনন্দ পেতে চায়, সে যেনো তালহা ইবন ওবায়দুল্লাহকে দেখে।'

তাঁর নাম তালহা। ডাক নাম আবূ মুহাম্মদ তালহা ও আবূ মুহাম্মদ ফাইয়াজ। আব্বার নাম ওবায়দুল্লাহ এবং মা'র নাম সোবাহ্ বা সা'বা। তালহার বংশগত সম্পর্ক সপ্তম পুরুষ গিয়ে রাসূল (সা.)-বংশ লতিকার সাথে মিলিত হয়েছে। অপর দিকে তাঁর মা সোবাহ্ (রা.) প্রখ্যাত সাহাবী আলী ইবনুল হাদরামীর (রা.) বোন ছিলেন।

রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম দিকেই তালহা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনেরো বছর। হযরত তালহা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ছিলো একটি চমকপ্রদ ঘটনা। ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে ঐ কিশোর বয়সেই অন্যান্য আরব ব্যবসায়ীর সাথে তালহা (রা.) ব্যবসায়িক কাজে বসরা যান। তাদের বাণিজ্য কাফেলা বসরা শহরে পৌছানোর পর সবাই কেনা-বেচার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরই এক পর্যায়ে তালহা (রা.) অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তিনি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাজারে ঘোরাফেরার সময়ে এমন একটি ঘোষণা শুনলেন যা তাঁর জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দিলো। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি তখন বসরভার বাজারে। একজন খৃষ্টান পাদ্রীকে ঘোষণা করতে শুনলাম-'ওহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। আপনারা এ বাজারে আগত লোকদের জিজ্ঞেস করুন, তাদের মধ্যে মক্কাবাসী কোন লোক আছে কিনা।' আমি নিকটেই ছিলাম। দ্রুত তার কাছে গিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি মক্কার লোক।' জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের

www.icsbook.info

মধ্যে আহমদ কি আত্মপ্রকাশ করেছেন?' বললাম, 'কোন আহমদ?' বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবন আবদিল মুত্তালিবের পুত্র। যে মাসে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন, এটা সেই মাস। তিনি হবেন শেষ নবী। মক্কায় আত্মপ্রকাশ করে কালো পাথর ও খেজুর উদ্যান বিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরত করবেন। যুবক, খুব তাড়াতাড়ি তোমার 'তাঁর কাছে যাওয়া উচিত।' এরপর তালহা (রা.) বলেন, 'তাঁর এ কথা আমার অন্তরে দারুণ প্রভাব বিস্তার করলো। আমি আমার কাফেলা ফেলে রেখে বাহনে সওয়ার হলাম। বাড়িতে পৌঁছেই পরিবারের লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আমার যাওয়ার পর মক্কায় নতুন কিছু কি ঘটেছে? তারা বললো, 'হ্যাঁ, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (সা.) নিজেকে নবী বলে দাবী করছে এবং আবূ কুহাফার ছেলে আবূ বকর তাঁর অনুসারী হয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, 'আমি আবূ বকরের (রা.) কাছে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম-এ কথা কি সত্যি যে, মুহাম্মদ নবূয়াত দাবী করেছেন এবং আপনি তাঁর অনুসারী হয়েছেন?' তিনি বললেন হ্যাঁ, তারপর আমাকেও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি তখন তাঁর কাছে খৃষ্টান পাদরীর সব কথা খুলে বললাম। অতপর তিনি আমাকে রাসূল (সা.)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে কলেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং নবী (সা.)-এর কাছে পাদরীর সব কথা বললাম। তিনি শুনে খুব খুশি হলেন। এভাবে আমি হলাম হযরত আবূ বকর (রা.)-এর হাতে চতুর্থ ইসলাম গ্রহণকারী।

হযরত তালহা (রা.)-এর আব্বা ওবাইদুল্লাহ রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। তবে তাঁর মা সোবাহ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘজীবী হন। একটা ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত ওসমান (রা.) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন তখন সোবাহ (রা.) হযরত তালহা (রা.) কে উদ্দেশ্যে করে বলেন, 'বাবা! তুমি স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বিদ্রোহীদেরকে সরিয়ে দাও।' এ সময় তালহার (রা.) বয়স ষাট বছর। এ হিসাব মতে

www.icsbook.info

সোবাহ্ (রা.) কমপক্ষে আশি বছর জীবিত ছিলেন।

তালহা'র (রা.) শৈশব-কৈশোর সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায় না। এটুকু জানা যায় যে, তিনি রাসূল (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের চব্বিশ কি পঁচিশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। আর একটা ব্যাপারে সবাই একমত-তাহলো তিনি খুব শৈশবকাল থেকেই ব্যবসার সাথে জড়িত হন এবং একটু বড় হলেই ব্যবসায়িক কাজে দেশে-বিদেশ গমন করেন। অনান্যের মতো হযরত তালহা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর নানাভাবে অত্যাচারিত হন। বিশেষ করে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয় বেশী। এ ব্যাপারে তাঁর মা সোবাহ্ও কম ছিলেন না। মাসউদ ইবন খারাশ বলেন, 'একদিন আমি সাফা মারওয়ার মাঝখানে দৌড়াচ্ছি, এমন সময় দেখলাম, একদল লোক হাত পা বাঁধা একটি যুবককে ধরে টেনে নিয়ে আসছে। তারপর তাকে উপুড় করে শুইয়ে তাঁর পিঠে ও মাথায় বেদম মার শুরু করলো। তাদের পেছনে একজন বৃদ্ধা মহিলা চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে তাকে গাল দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম-ছেলেটির এ অবস্থা কেন? তারা বললো, এ হচ্ছে তালহা ইবন ওবাইদুল্লাহ। পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে বানূ হাশিমের সেই লোকটির অনুসারী হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, এই মহিলাটি কে? তারা বললো, সোবাহ বিনতু আল হাদরামী, যুবকটির মা।

তালহার আপন ভাই ওসমান ইবন ওবাইদুল্লাহ এবং কুরাইশদের সিংহ বলে পরিচত নাওফিল ইবন খুয়ায়লিদও তাঁর সাথে নির্দয় ব্যবহার করে। তারা একই রশিতে তালহা (রা.) ও হযরত আবূ বকর (রা.) কে বেঁধে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এমনকি তাদেরকে মক্কার গুণ্ডাদের হাতে তুলে দেয়া হয় নির্যাতন করার জন্য। এত কিছুর পরও তারা ছিলেন ইসলামের প্রতি অটল অচল। হযরত তালহা ও আবূ বকরকে এক রশিতে বাঁধা হয়েছিলো এ জন্য তাদেরকে বলা হয় 'কারীনান'।

হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই গোপনে তালহা (রা.) ইসলাম প্রচারে

www.icsbook.info

কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ৬২২ সনের অক্টোবর মাসে রাসূল (সা.) হযরত আবূ বকরকে সঙ্গে নিয়ে হিযরত করেন। তাদের পথ প্রদর্শক আবদুল্লাহ ইবন ইরায়কাত মক্কায় ফিরে আবূ বকরের পুত্র আবদুল্লাহকে সব ঘটনা বলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে আবূ বকর পরিবার-পরিজনসহ মদীনায় হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এমন সময় তালহা (রা.) ও শুয়াইব ইবন সিনান তাদের সাথে যোগ দেন। হযরত তালহা (রা.) এই কাফেলার আমীর নির্বাচিত হন।

মদীনায় পৌঁছে হযরত আসয়াদ-এর বাড়িতে তালহা (রা.) ও সুহায়েব ইবন সিনান অতিথি হন। মক্কায় অবস্থান কালে রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরত করেন তখন তালহার সাথে প্রখ্যাত সাহাবী আবূ আইউব আনসারীর সাথে ভাই সম্পর্ক করে দেন। আর একটি বর্ণনায় জানা যায়, রাসূল (সা.) কাব বিন মালিকের (রা.) সাথে তাঁর ভাই সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁরা আপন ভাইয়ের মত আমৃত্যু সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেছিলেন।

ইসলামের ইতিহাসে হিজরী দ্বিতীয় সন থেকে যুদ্ধাভিযান শুরু হয়। সর্বপ্রথম যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার নাম বদরের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে হযরত তালহা (রা.) অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এ যুদ্ধের সওয়াব থেকে তিনি বঞ্চিত হননি। বদর যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত মালে গণিমতের অংশও তিনি পেয়েছিলেন। মালে গণীমতের অংশ তালহা (রা.) কে প্রদানকালে রাসূল (সা.) বলেন, 'তুমি জেহাদের সওয়াব থেকে মারহুম হবে না।'

আসল ব্যাপার হলো, বদর যুদ্ধের সময় একদল কাফির মদীনার জনপদের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করছিলো। রাসূল (সা.) এ ষড়যন্ত্রের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য হযরত তালহাকে সেখানে পাঠান। যার কারণে তিনি বদরযুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। তাই আমরা বলতে পারি তিনি বদর যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ না নিলেও পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন।

হিজরী তৃতীয় সনে সংঘটিত ওহুদ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

www.icsbook.info

এবং এ যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ওহুদ যুদ্ধের সেই সময়টি যখন মুসলমানরা শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, রাসূল (সা.) কে ঘিরে মুষ্টিমেয় কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদ সাহাবী ছাড়া আর কেউই ছিলো না, হযরত তালহা (রা.) ছিলেন তাদের অন্যতম। এ সময় শত্রুদের হাতে আম্মার বিন ইয়াযিদ শহীদ হন। অন্যান্য সাহাবীরাও দারুণভাবে আহত হন। আবূ দুজানা তো রাসূল (সা.)-এর দেহকে আড়াল করে নিজের পুরো দেহটিকে ঢাল বানিয়ে নেন। আর হযরত তালহা (রা.) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ঢাল তলোয়ার নিয়ে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ঘুরে ঘুরে রাসূল (সা.) কে হেফাজত করার চেষ্টা করেন। তাঁর একক আক্রমণের প্রচণ্ডতায় সেদিন ওহুদ যুদ্ধের মোড় পুনরায় ভিন্ন রূপ নেয়। এরই এক পর্যায়ে যখন কাফেরদের আক্রমণ হ্রাস পায় তখন তালহা (রা.) রাসূল (সা.) কে পিঠে তুলে পাহাড়ের ওপর নিরাপদ স্থানে পৌছান।

ওহুদ যুদ্ধে তালহা (রা.) মারাত্মক আহত হন। এ সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, ' এ সময় আমি ও আবূ উবাইদা রাসূল (সা.) থেকে দূরে সরে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা রাসূল (সা.)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁর সেবার জন্য এগিয়ে গেলে তিনি বললেন, 'আমাকে ছাড়ো, তোমাদের বন্ধু তালহাকে দেখো।' আমরা তাকিয়ে দেখি তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় একটি গর্তে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্নপ্রায় এবং সারা দেহে তরবারী, তীর ও বর্শার সত্তরটিরও বেশী আঘাত।' এ কারণেই রাসূল (সা.) তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'যদি কেউ কোন মৃত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াতে দেখে আনন্দ পেতে চায়, সে যেনো তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহকে দেখে।' তাঁকে জীবিত শহীদ বলার কারণও এটাই।

রাসূল (সা.) ওহুদ যুদ্ধে বীরত্বের কারণে তাঁকে খাইর (অতি উত্তম) উপাধিতে ভূষিত করেন। হযরত আবূ বকর (রা.) ওহুদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠলেই বলতেন, 'সে দিনটির সবটুকুই তালহার।' হযরত ওমর (রা.) তাঁকে 'সাহেবে ওহুদ অর্থাৎ ওহুদওয়ালা' বলে সম্বোধন করতেন।

www.icsbook.info

মূলত এ যুদ্ধে হযরত তালহার ভূমিকায় রাসূল (সা.) মুগ্ধ হয়েই তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দেন।

এক বদর যুদ্ধ ছাড়া তাঁর জীবদ্দশায় যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তিনি তার সব ক'টিতেই সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত তালহা (রা.) রাসূল (সা.)-এর সাথেই ছিলেন এবং তাঁর সাথেই কাবা ঘরে প্রবেশ করেন।

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধেও মুসলমানদের অবস্থা অনেকটা ওহুদের মত হয় কিন্তু হযরত তালহাসহ কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদের কারণে নিশ্চিত পরাজয় থেকে মুসলমানরা রক্ষা পান।

বিদায় হজ্বে রাসূল (সা.)-এর যারা সফর সঙ্গী ছিলেন হযরত তালহা (রা.) সেইসব সৌভাগ্যবানদের একজন ছিলেন। জানা যায় এ সফরে রাসূল (সা.) ও তালহা (রা.) ছাড়া আর কারো কাছে কোরবানীর পশু ছিলো না।

রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালে তালহা (রা.) এতই বেদনা বিধুর হয়ে পড়েন যে, তিনি জনগণ থেকে দূরে একাকী অবস্থান গ্রহণ করেন। এমনকি খলীফা নির্বাচনের সময়ও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি নিজে বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সকল মুসীবতে ধৈর্য ধারণের হুকুম দিয়েছেন, তাই তাঁর বিচ্ছেদে 'সবরে জামীল' অবলম্বনের চেষ্টা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে তাওফিক কামনা করি।'

হযরত আবূ বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার বেশ কয়েকদিন পরে তালহা (রা.) বাইয়াত গ্রহণ করলেও খলীফাকে পরামর্শ দানের ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ছিলেন। যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে খলীফার জিহাদ ঘোষণার পক্ষে রায় দিয়ে তালহা বলেন, 'যে দ্বীনে যাকাত থাকবে না তা সত্য ও সঠিক হতে পারে না।'

হযরত ওমর (রা.)-এর কঠোর ব্যবহারের কারণে হযরত তালহা (রা.) খলীফা মনোনয়নের সময় তাঁর বিপক্ষে মত দেন। কিন্তু হযরত

www.icsbook.info

ওমর (রা.) খলীফা হলে সেই তালহা (রা.) হন তাঁর প্রধান পরমর্শদাতা।

হযরত ওসমান (রা.) বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাঁর হেফাজতের জন্য তালহা (রা.) পুত্র মুহাম্মদ ইবন তালহা (রা.) কে নিয়োগ করেন। হযরত ওসমান (রা.) বিদ্রোহীদের হাতে শহীদ হলে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। হযরত ওসমানের হত্যার বিচারের দাবীতে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে ইহুদী ইবন সাবা মুসলমান সেজে সুযোগ গ্রহণ করে। তারই চক্রান্ত মুসলমানদেরকে দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলে। এক পর্যায়ে হযরত তালহা (রা.) ও যুবায়ের (রা.) মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে হযরত আয়েশার (রা.) সাথে পরামর্শ করে বসরার দিকে রওনা হন। হযরত আলী (রা.) এ সংবাদ পেয়ে বসরার উপকণ্ঠেই তাদের বাঁধা প্রদান করেন। ফলে উভয় পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করে। পরে হযরত কাকা ইবন আমরের মধ্যস্থাতায় উভয় পক্ষ যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ঐ ইবন সাবার তাবেদার লোকেরা রাতের অন্ধকারে উভয় পক্ষের ঘুমন্ত সৈনিকদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। হঠাৎ এ আক্রমণে ঘুমন্ত সৈনিকরা মনে করলো প্রতিপক্ষ অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেছে। ফলে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিহাসে এ যুদ্ধকে উটের যুদ্ধ বলে। এ যুদ্ধে প্রতিপক্ষের একটি তীর এসে হযরত তালহার (রা.) পায়ে বিধে। ক্ষতস্থান থেকে বিরামহীনভাবে রক্ত পড়তে থাকে। কোনভাবেই যখন রক্তপড়া বন্ধ করা যাচ্ছিলো না, তখন কাকা ইবন আমরের অনুরোধে তিনি দারুন ইলাজে (হাসপাতাল) যান। অবশ্য সে সময় অনেক দেরি হয়ে গেছে। শরীর রক্তশূন্য হওয়ার কারণে দারুল ইলাজে পৌছানোর কিছুক্ষণ পরেই তিনি শাহাদাতবরণ করেন। বসরাতেই তাঁকে দাফন করা হয়। দিনটি ছিল হিজরী ৩৬ সনের জমাদিউল আওয়াল, অন্যমতে ১০ই জমাদদিউস সানী। এ সময়ে তাঁর বসয় হয়েছিল ৬৪ বছর।

হযরত তালহা (রা.) ছিলেন সেই যুগের একজন বিত্তশালী

www.icsbook.info

ব্যবসায়ী। অর্জিত অর্থ দুহাতে দান করতেও তিনি ছিলেন খুবই উদার। যার কারেণ ঐতিহাসিকরা তাকে দানশীল তালহা বলে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর দানশীলতার ব্যাপারে তোমাদেরকে একটা গল্প শোনাই। হাদরামাউত থেকে একবার তাঁর হাতে নগদ সত্তর হাজার দিরহাম এলো। কিন্তু এতো টাকা তিনি কি করবেন তা ভেবে পেরেশান হয়ে পড়লেন। রাতে ঘুম হলো না। এ অবস্থা দেখে স্ত্রী হযরত আবূ বকরের কন্যা উম্মে কুলসুম স্বামীকে বললেন, 'আপনার কি কিছু হয়েছে? আমার কোনো আচরণে কি কষ্ট পেয়েছেন ?

'না! একজন মুসলমানের স্ত্রী হিসেবে তুমি খুবই চমৎকার। কিন্তু আমি সেই সন্ধ্যা থেকে ভাবছি এতো নগদ টাকা ঘরে রেখে ঘুমালে আল্লাহ তাঁর বান্দাহ সম্বন্ধে কি ভাববেন?'

'এতে ঘাবড়াবার কি আছে। এতো রাতে গরীব দুঃখী ও আপনার আত্মীয়স্বজনদের কোথায় পাবেন? সকাল হলেই তাদের মাঝে ভাগ করে দেবেন।'

'আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। একেই বলে বাপ কে বেটি।'

পরদিন ভোর হতে না হতেই আলাদা আলাদা প্যাকেটে সকল টাকা মুহাজির ও আনসার গরীব মিসকিনদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। অন্য একটি ঘটনাতেও দানশীল তালহাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। একবার এক ব্যক্তি এসে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বলে তাঁর কাছে কিছু সাহায্যের জন্য আবেদন করলো। তালহা (রা.) লোকটিকে বললেন, 'অমুক স্থানে আমার একটুকরো জমি আছে। জমিটুকু তুমি নিতে পারো অথবা ঐ জমিটুকুর মূল্য হিসাবে হযরত ওসমান আমাকে তিনলাখ দিরহাম দিতে চেয়েছেন, তুমি ইচ্ছে করলে দিরহামও নিতে পারো।' লোকটি নগদ তিন লাখ দিরহামই নিলো।

জানা যায়, বানূ তামীম গোত্রের দুঃস্থ গরীবদের তিনি একাই লালন পালন করতেন। মোট কথা তিনি নিজেকে দুঃস্থ মানবতার সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন।

www.icsbook.info

ব্যক্তিগতভাবে তিনি অত্যন্ত উঁচুস্তরের মানুষ ছিলেন। একটি ঘটনা বললে ব্যাপারটি সবার কাছে পরিষ্কার হবে। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উতবা ইবনে রাবীয়ার কন্যা উম্মে আবানকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন কিন্তু উম্মে আবান সমস্ত প্রস্তাব বাতিল করে হযরত তালহাকে পছন্দ করেন। এর কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'আমি তার স্বভাব চরিত্র অবগত আছি। তিনি ঘরে ঢোকার সময় হাসতে হাসতে ঢোকেন এবং যাওয়ার সময় হাসতে হাসতে যান। কেউ কিছু চাইলে কার্পণ্য করেন না এবং না চাইলেও অপেক্ষা করেন না। কেউ তাঁর কাজ করে দিলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন এবং অপরাধ করলে ক্ষমা করেন।

তাবুকের যুদ্ধে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) অংশগ্রহণ না করায় তাঁর ওপর রাসূল (সা.) নাখোশ হন। পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে মাফ করে আয়াত নাযিল হলে তালহা (রা.) ছুটে যান এবং কা'ব (রা.)-এর সাথে করমর্দন করেন। এ ব্যাপারে কা'ব (রা.) বলেন, 'আমি তালহার (রা.) এই ব্যবহার কখনও ভুলবো না। কারণ, মুহাজিরগণের মধ্যে কেউই তাঁর মতো এমন ভাবে এগিয়ে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করেনি।

www.icsbook.info

হযরত আবূ ওবাইদাহ ইবনুল জার্‌রাহ (রা.)

নাম আমের। ডাক নাম আবূ ওবাইদাহ। উপাধি আমনুল উম্মত। তিনি তাঁর আব্বা আবদুল্লাহ'র নামে পরিচিত না হয়ে দাদার নামে অর্থাৎ ইবনুল জার্‌রাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার বংশ তালিকা নিম্নরূপ–আমের ইবন আবদুল্লাহ, ইবন জাররাহ, ইবন হেলাল, ইবন উহাউব, ইবন জাররাহ, ইবন হারেস, ইবন ফেহ্‌র আল কারশী আল-যোহরী। তার উর্ধতন পঞ্চম পুরুষ ফেহ্‌র-এর সাথে গিয়ে রাসূল (সা.)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়। তাঁর মা এ ফেহ্‌র বংশের মেয়ে ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ডাক নাম আবূ ওবাইদাহ নামেই খ্যাত হন।

যতদূর জানা যায় হযরত আবূ বকর (রা.)–এর ইসলাম গ্রহণের পরের দিনই তিনি মুসলমান হন। তিনি আবূ বকরের (রা.) হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। এরপর আবদুর রহমান ইবন আউফ, আল আরকাম ইবন আবিল আরাকাম, উসমান ইবন মাজউনকে সংগে নিয়ে রাসূল (সা.)–এর খেদমতে হাজির হন এবং একসাথে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন।

মক্কায় মুসলমানদের বসবাস করা পিবদজনক হতে থাকলে রাসূল (সা.)–এর নির্দেশে অনেকেই হাবশায় হিজরত করেন। হযরত আবূ ওবাইদাহ কোরাইশ জালিমদের অত্যাচারে দু'দুবার হাবশায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরত করলে তিনিও মদীনায় হিজরত করেন। অর্থাৎ তিনি মোট তিন তিনবার হিজরত করেন। মদীনায় হিজরতের পর রাসূল (সা.) তাঁকে সা'দ ইবন মু'আযের সাথে ভাই পাতিয়ে দেন।

হযরত আবূ ওবাইদাহ সেই ব্যক্তি যিনি ইসলামের জন্য আপন মুশরিক পিতাকে হত্যা করেন। ঘটনা এরকম, বদরের প্রান্তরে মুসলিম ও কোরাইশ মুশরিকদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। হযরত আবূ

www.icsbook.info

ওবাইদাহ বীর বিক্রমে মুশরিক কাফিরদের ওপর আঘাত হেনে চলেছেন, তাঁর আঘাতের প্রচণ্ডতায় কাফিররা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারা হয়ে পালাতে শুরু করেছে। ঠিক এসময়ে অথবা তার পূর্ব থেকে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ তাঁর দিকে তীর ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে এলো এবং পুত্র ওবাইদাকে হত্যা করার জন্য নানান কোশেষ করতে লাগলো। ওবাইদাহ পিতাকে এড়িয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু পারলেন না। এক পর্যায়ে পিতা আবদুল্লাহ যখন শত্রু ও তার মধ্যে চরম বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো তখন বাধ্য হয়েই তিনি তরবারির এক কোপে পিতার দেহ থেকে মাথাটি বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

এরপর পরই সূরা আল মুজাদিলার এ আয়াতটি নাজিল হয়–

'তোমরা কখনো এমনটি দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। তারা তাদের পিতা-ই হোক কিংবা তাদের পুত্র-ই হোক বা ভাই হোক অথবা তাদের গোত্রের লোক। তারা সেই লোক যাদের দিলে আল্লাহ তা'আলা ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ হতে একটা রূহ দান করে তাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হবে। তাতে তাঁরা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে তাঁর প্রতি। এঁরা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রাখো, আল্লাহর দলের লোকেরাই কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।'

একবার খৃষ্টানদের এক প্রতিনিধিদল রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে তাঁর মনোনীত একজন প্রতিনিধি তাদের সাথে দিতে বললেন। এজন্য যে, তিনি গিয়ে তাদের বিতর্কিত কিছু সম্পদের ফয়সালা করে দেবেন। একথা শুনে রাসূল (সা.) তাদেরকে সন্ধ্যায় আসতে বলে বললেন, 'আমি তোমাদের সাথে একজন দৃঢ়চেতা ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাবো।' ওমর (রা.) বলেন, 'আমি সেদিন সকাল সকাল জোহরের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হলাম। আর আমি এদিনের মতো আর কোন দিন নেতৃত্বের জন্য লালায়িত হইনি। এর একমাত্র

www.icsbook.info

কারণ আমিই যেনো হতে পারি রাসূল (সা.)-এর এ প্রশংসার পাত্রটি।

রাসূল (সা.) আমাদের সাথে জোহরের সালাত শেষ করে ডানে বায়ে দেখতে লাগলেন। আর আমিও তাঁর দৃষ্টিতে পড়ার জন্য আমার গর্দানটি একটু উঁচু করতে লাগলাম। কিন্তু তিনি তাঁর দৃষ্টি ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় আবূ ওবায়দা ইবনুল জার্‌রাহকে দেখতে পেলেন। তাঁকে ডেকে তিনি বললেন, তুমি তাদের সাথে যাও এবং সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে তাদের বিতর্কিত বিষয়টির ফয়সালা করে দাও।'

ওহুদের যুদ্ধে যে দশজন সাহাবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে ঘিরে ব্যূহ রচনা করেছিলেন, যাঁরা তাঁদের জান বাজি রেখে আল্লাহর নবীর হেফাজতের চেষ্টা করেছিলেন, ওবায়দাহ (রা.) তাদেরই একজন। যুদ্ধ শেষে যখন দেখা গেলো রাসূল (সা.)-এর চেহারা মোবারক যখম হয়েছে, দু'টি দাঁত শহীদ হয়েছে এবং লৌহবর্মের দু'টি বেড়ি গণ্ডদেশে ঢুকে গেছে। হযরত আবূ বকর (রা.) এ দৃশ্য দেখে ছুটে এসে বেড়ি দু'টি দ্রুত খোলার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু ওবায়দাহ তাকে বাঁধা দিয়ে নিজেই রাসূল (সা.)–এর কাছে এগিয়ে গেলেন, হাত দিয়ে তুলতে গেলে যদি নবী (সা.) কষ্ট পান তাই তিনি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সাবধানে বেড়ি বের করে আনলেন। কিন্তু বেড়ি দুটো মারাত্মকভাবে ঢুকে যাওয়ার কারণে ওবায়দাহর (রা.) দুটো দাঁত ভেঙ্গে যায়। রাসূল (সা.)-এর প্রতি এ প্রেম দেখে হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, 'আবূ ওবায়দাহ সর্বোত্তম দাঁত ভাঙ্গা ব্যক্তি।'

হযরত ওবায়দা (রা.) ওহুদ, খন্দক ছাড়াও বানূ কুরাইজা অভিযানেও অংশ গ্রহণ করেন। বাইয়াতে রেদওয়ানেও তিনি শরীক হন, হুদাইবিয়ার সন্ধিতে তিনি একজন স্বাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেন। সপ্তম হিজরী সনে রাসূল (সা.)-এর সাথে খাইবার অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং অসম্ভব বীরত্বের পরিচয় দেন। যাতুস সালাসিলে পৌঁছে হযরত আমর ইবনুল আস যখন বুঝলেন আরো সৈন্য প্রয়োজন তখন তিনি রাসূলের (সা.) খেদমতে সাহায্য চেয়ে পাঠান। তখন রাসূল (সা.) আবূ ওবায়দাহর নেতৃত্বে দু'শ সৈন্য আমর ইবনুল আসের সাহায্যে প্রেরণ করেন। তোমরা শুনলে বিস্মিত হবে

www.icsbook.info

যে, এ যোদ্ধাদের মধ্যে প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর ও দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) ছিলেন। মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধ, তায়েফের যুদ্ধসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের সনে আবূ ওবায়দাহর নেতৃত্বে সামুদ্রিক এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ অভিযানে তাদেরকে খাবার হিসাবে কিছু খেজুর দেয়া হয়েছিলো এবং তা এতো কম ছিলো যে, জন প্রতি দৈনিক মাত্র একটি খেজুর নির্ধারিত ছিলো। পরবর্তীতে অবশ্য তারা প্রকাণ্ড একটি মাছ পাওয়ায় খাদ্যাভাব দূর হয়।

রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর খলীফা নির্বাচন নিয়ে জটিলতা দেখা দিলে হযরত আবূ বকর (রা.) ওবায়দাহ (রা.) কে বললেন, 'আপনি হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে বাইয়াত করি। আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে, তুমি এ জাতির সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি।' উত্তরে ওবায়দাহ বললেন, 'আমি এমন ব্যক্তির সামনে হাত বাড়াতে পারিনা যাঁকে রাসূল (সা.) আমাদের নামাযের ইমামতির আদেশ করেছেন এবং তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ইমামতি করেছেন।' হযরত আবূ ওবায়দাহর (রা.) এমন দিকনির্দেশনা মূলক কথার পর পরই সবাই হযরত আবূ বকরের হাতে বাইয়াত হন। পরে খলীফা নির্বাচনের জটিলতাও দূরিভূত হয়। হযরত ওমর (রা.) খলীফা হলে আবূ ওবায়দা বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁর হাতে বাইয়াত হন।

হযরত আবূ বকর (রা.) খেলাফতের তৃতীয় সনে চতুর্দিক থেকে শাম দেশ আক্রমণের সিদ্ধান্ত হয়। সময়ের হিসেবে হিজরী ১৩ সন ছিল পরিকল্পনা অনুযায়ী হযরত আবূ বকর (রা.) হেমসের দিকে, আবূ ওবায়দাহকে দামেস্কের দিকে, ইয়াজিদ ইবন আবূ সুফিয়ানকে জর্দানের দিকে শোরাহবিলকে এবং ফিলিস্তিনের দিকে আমর ইবনুল আসকে প্রেরণ করেন। তবে তিনি তাদেরকে বলেন, 'আপনারা সকলে একত্র হলে আবূ ওবায়দাহ সেনাপতি হবেন।'

হিজরী ১৭ সনে হযরত ওমর (রা.) দামেস্কের আমীর ও ওয়ালীর পদ থেকে হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদকে অপসারণ করে সেখানে

www.icsbook.info

আবূ ওবায়দাহকে নিয়োগ দেন। এ সিদ্ধান্ত শোনার পর খালিদ সাইফুল্লাহ দামেস্কের লোকদেরকে বলেন, তোমাদের খুশি হওয়া উচিৎ যে, আমীনুল উম্মত তোমাদের ওয়ালী।'

হযরত আবূ ওবায়দার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী দামেস্ক, হিমস্ প্রভৃতি শহর একের পর এক জয় করেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধ তিনিই পরিচালনা করেন। সমগ্র সিরিয়া তাঁর করায়াত্বে নিয়ে আসেন। এ সময় সিরিয়ায় মারাত্মক আকারে প্লেগ রোগ দেখা দেয়। ফলে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক এরোগে আক্রান্ত হচ্ছিলো। হযরত ওমর (রা.) এ সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়লেন। এমনকি তিনি মদিনা থেকে স্বয়ং সুরাগ নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। হযরত ওবায়দাহ (রা.) গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ খলীফাকে অভ্যর্থনা জানালেন। প্লেগের ব্যাপারে অনেক কথা বার্তার পর খলীফা হযরত ওবায়দাহকে তাঁর সাথে মদিনায় যেতে বললেন। কিন্তু ওবায়দাহ (রা.) অন্যান্যদেরকে এ অবস্থায় ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'কপালের লেখা কখনও বদলায় না। সুতরাং মুসলমানদিগকে ত্যাগ করে আমি এখান থেকে কোথাও যাওয়া ভাল মনে করছি না।'

পরবর্তীতে হযরত ওবায়াদাহ (রা.) প্লেগে আক্রান্ত হন। রোগের অবস্থা ক্রমাবনতির দিকে গেলে তিনি হযরত মুয়াজ ইবন জাবাল (রা.) কে নামাযের ইমামতির হুকুম দেন। অতপর লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'বন্ধুগণ! এ রোগ আল্লাহর রহমত এবং রাসূল (সা.)-এর দো'আ ইতোপূর্বে অসংখ্যা মুমীন মুসলমান এ রোগে বিদায় নিয়েছেন। এখন আবূ ওবায়দাও সেই পথে তাঁর প্রভুর মিলন প্রার্থী।'

এরপর হযরত মুয়ায (রা.) নামায শুরু করলে হযরত ওবায়দাহ (রা.) ইন্তেকাল করেন। -ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মুয়াজ ইবন জাবাল (রা.) তাঁর কাফন দাফনের ব্যবস্থা করলেন এবং সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বন্ধুগণ! আজই এ ব্যক্তি আমাদেরকে নিঃসঙ্গ করে চলে গেলেন। খোদার কসম, যাঁর মতো নির্মল ও কোমল অন্তর, সিঃস্বার্থ, অহিংসুক, দূরদর্শী এবং জনগণের হিতাকাঙ্খী আমি আর দেখি নি। তাঁর আত্মার মাগফেরাতের

www.icsbook.info

জন্য সকলেই দোয়া করুন।'

হিজরী ১৮ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। এসময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল আটান্ন বছর।

হযরত ওবায়দাহ (রা.)-এর লাশের জানাযা পড়ান মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)। দাফন করার সময় কবরে নামেন মুয়াজ, আমর ও দাহ্‌ক। লাশ দাফনের পর হযরত মুয়াজ (রা.) বলেন, 'আবূ ওবায়দা, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। আল্লাহর কসম! আমি আপনার সম্পর্কে যতটুকু জানি কেবল ততটুকুই বলবো, অসত্য কোন কিছু বলবো না। কারণ, আমি আল্লাহর শাস্তির ভয় করি। আমার জানা মতে আপনি ছিলেন আল্লাহকে অত্যাধিক স্মরণকারী, বিনম্রভাবে যমীনের ওপর বিচরণকারী ব্যক্তিদের একজন। আর আপনি ছিলেন সেই সব ব্যক্তিদের অন্যতম যাঁরা তাঁদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করে এবং যাঁরা খরচের সময় অপচয়ও করে না, কার্পণ্যও করে না বরং মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে থাকে।'

হযরত আবূ ওবায়দাহ (রা.) প্রায়ই পরকালের ভয়ে কান্নাকাটি করতেন। কারণ জীবনের শেষ দিকে তার সহায় সম্পদ প্রচুর হয়েছিল। এ প্রসংগে তিনি নিজেই বলেছেন, এখন দেখছি, আমার বাড়ি খাদেমে এবং আস্তাবল ঘোড়ায় ভরে গেছে। হায় আমি কিভাবে রাসূললুল্লাহকে (সা.) মুখ দেখাবো? রাসূল (সা.) বলেছিলেন, সেই ব্যক্তিই আমার সর্বাধিক প্রিয় হবে, যে ঠিক সেই অবস্থায় আমার সাথে মিলিত হবে যে অবস্থায় আমি তাকে ছেড়ে যাচ্ছি।

হযরত আবূ ওবায়দাহ ছিলেন, দীর্ঘাঙ্গী হালকা পাতলা গড়ন, গৌরকান্ত ও প্রজ্জ্বল মুখমণ্ডলের অধিকারী। তিনি দেখতে এতো সৌম দর্শন ছিলেন যে সবারই চোখ জুড়িয়ে যেতো। তাকে দেখার সাথে সাথে ভেতরে ভেতরে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জাগ্রত হতো। রাসূল (সা.)-এর ভাষায় তিনি ছিলেন জাতির বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তি। সর্বোপরি তিনি ছিলেন ঐ সম্মানীত দশজন সাহাবীর একজন যাঁরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকতেই বেহেশতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন।

www.icsbook.info

হযরত সাঈদ ইবন যায়িদ (রা.)

'আপনারা জেহাদ করবেন আর আমি বঞ্চিত থাকবো, আমি তা সহ্য করতে পারবো না। যে গভর্নরের পদ গ্রহণ করে আমার জেহাদকে কোরবানী দিতে হবে, আমার পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং পত্র পাওয়া মাত্র অনতিবিলম্বে অপর একজনকে আমার স্থলে প্রেরণ করুন। অতিতাড়াতাড়িই আমি আপনার খেদমতে হাজির হতে চাই।' এ ছিলো সদ্য দামেস্কের গভর্নর পদ প্রাপ্ত হযরত সাঈদ (রা.)-অভিমত। দামেস্ক ও ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হযরত আবূ ওবাইদাহ, হযরত সাঈদ ইবন যায়িদ (রা.) কে দামেস্কের গভর্নর করে পাঠালে তিনি এ উক্তি করেন।

তাঁর নাম সাঈদ। ডাকনাম আবুল আওয়ার। আব্বার নাম যায়িদ এবং মার নাম ফাতিমা বিনতে বাজা। তাঁর বংশগত শাজরা এ রকম- সাঈদ ইবন যায়িদ, ইবন আমর, ইবন কোযাইল, ইবন আবদুল ওয্যা, ইবন রিয়াহ, ইবন আবদুল্লাহ, ইবন কুরয, ইবন যারাহ, ইবন আদী, ইবন কা'ব ইবন লুওয়াই আল কারশী আল আদাভী। উর্ধ্বতন পুরুষ কাব ইবন লুওয়াই পর্যন্ত গিয়ে রাসূল (সা.)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে।

সাঈদ (রা.) সেই সৌভাগ্যবান পিতার সন্তান যিনি ইসলামের আগমনের পূর্বেই পৌত্তলিকতা ও শিরক থেকে নিজেকে হেফাজত করে তাওহীদের আলোকে আলোকিত হন। আইয়ামে জাহেলিয়াতের সেই যুগেও তিনি সকল প্রকার অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। এমন কি মুশরিকদের হাতে জবাই করা জন্তুর গোশত পর্যন্ত তিনি স্পর্শ করেন নি।

বোখারী শরীফে বর্ণিত একটা ঘটনা থেকে জানা যায় যে,

www.icsbook.info

নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে একদিন তানঈমের পথে ওয়াদিয়ে বালদাহ নামক স্থানে সাঈদের (রা.) পিতা যায়িদের সাথে রাসূল (সা.)-এর দেখা হয়। সেখানে রাসূল (সা.) কে খাবার দিলে তিনি খেতে অস্বীকার করেন। এরপর যায়িদকে দেয়া হলে তিনিও তা খেতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, 'আমি তোমাদের মূর্তির জন্য যবাইকৃত খাদ্য খাইনা।'

শুধু তাই নয় তিনি দেবদেবীর নামে জন্তু জবাই করার তীব্র প্রতিবাদ পর্যন্ত করেছেন। কোন এক উৎসবের সময় যায়িদ দেখতে পান কুরাইশদের ধনী ব্যক্তি গৃহপালিত পশুকে জাকজমকের সাথে সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের আরাধ্য দেবদেবীর সামনে বলি দেওয়ার জন্য। এ দৃশ্য দেখে তিনি কাবার দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে বললেন, 'কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! এ ছাগল গুলি সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের পান করান, যমীনে ঘাস সৃষ্টি করে তাদের আহার দান করেন। আর তোমরা অন্যের নামে সেগুলি যবাই করো? আমি তোমাদেরকে একটি মূর্খ সম্প্রদায় হিসাবে দেখতে পাচ্ছি।'

যায়িদ-এর এহেন উক্তি শুনে চাচা আল খাত্তাব মানে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের আব্বা তাঁর গালে বসিয়ে দিল প্রচণ্ড এক থাপ্পড়। তারপর বললো, 'তোর সর্বনাশ হোক ! তোর মুখ থেকে এধরনের বাজে কথা সব সময় শুনেও সহ্য করে আসছি। সহ্যের সীমা আমাদের এখন অতিক্রম করে গেছে।' এতেও খাত্তাবের রাগ যখন পড়লনা তখন যায়িদের বিরুদ্ধে গোত্রের সহজ সরল লোকদেরকে লেলিয়ে দিলো। পরিস্থিতি এতদূর গড়ালো যে শেষ পর্যন্ত যায়িদ মক্কাতে টিকতে না পেরে হিরা গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তবুও খাত্তাব খুশি হতে পারলোনা, সে একদল কুরাইশ যুবককে সর্বদা পাহারায় রাখলো-যায়িদ যেনো মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে।

অবশ্য যায়িদ গোপনে-ওসমান ইবনুল হারিস, আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ, ওরাকা ইবন নাওফিল, উমাইমা বিনুত আবদুল মুত্তালিবের

www.icsbook.info

সাথে মিলিত হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আল্লাহর কসম। আপনারা নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখুন, আপনাদের এ জাতি কোন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নেই। তারা দ্বীনে ইবরাহীমকে বিকৃত করে ফেলেছে; তারা বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। আপনারা যদি মুক্তি চান তো নিজেদের জন্য একটি দ্বীন অনুসন্ধান করুন।"

যায়িদ সেই যুগেও একজন তওহীদবাদী হওয়ার কারণে গর্ভবোধ করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বড় বোন হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, 'একদিন আমি যায়িদকে কা'বা ঘরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। তিনি বলছিলেন, 'হে কুরাইশরা! আমি ব্যতীত তোমাদের কেউই ইবরাহীম (আঃ)- এর ধর্মাবলম্বী নও।'

তিনি যে চারজন কুরাইশকে দ্বীন অনুসন্ধানের পরামর্শ দিয়েছিলেন তার মধ্যে ওয়ারাকা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। অন্যরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। আর যায়িদ এর জীবনে ঘটলো ভিন্নতরো ঘটনা। তিনি প্রকৃত দ্বীন অনুসন্ধানের মানসে ইহুদী ও খৃষ্টান আলেমদের নিকট গেলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি ইহুদী ও খৃষ্ট ধর্ম সম্পর্কে অবগত হলামঃ কিন্তু সে ধর্মে মানসিক শান্তি পাওয়ার মতো তেমন কিছু না পেয়ে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলাম। এক পর্যায়ে আমি শাম দেশে এসে উপস্থিত হলাম। আগেই শুনেছিলাম সেখানে একজন 'রাহিব' সংসার ত্যাগী ব্যক্তি আছেন, যিনি আসমানী কিতাবে অভিজ্ঞ। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আমার কাহিনী বিবৃত করলাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'ওহে মক্কাবাসী ভাই, আমার মনে হচ্ছে আপনি দ্বীনে ইবরাহীম অনুসন্ধান করছেন।'

বললাম, 'হ্যাঁ! আমি তাই অনুসন্ধান করছি।'

তিনি বললেন, 'আপনি যে দ্বীনের সন্ধান করছেন, আজকের দ্বীনেতো তা পাওয়া যায় না। তবে সত্য তো আপনার শহরে। আল্লাহ আপনার কওমের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি পাঠাবেন যিনি দ্বীনে ইবরাহীম পুনরুজ্জীবিত করবেন। আপনি যদি তাঁকে পান তো তাঁর অনুসরণ করবেন।'

www.icsbook.info

যায়িদ দ্রুত মক্কার দিকে রওনা হলেন। কিন্তু পথিমধ্যে একদল ডাকাত কতৃক তিনি আক্রান্ত ও নিহত হন। ফলে মহানবী (সা.)-এর সাক্ষাত তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। তবে জানা যায় তিনি মৃত্যুর আগে আকাশের দিকে মুখ তুলে দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ ! যদিও এ কল্যাণ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন, আমর পুত্র সাঈদকে তা থেকে আপনি নিরাশ করবেন না।' যায়িদের এ দোয়া আল্লাহ পাক কবূল করেছিলেন। ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগে যাঁরা ইসলাম কবূল করেন হযরত সাঈদ (রা.) তাঁদেরই একজন। সম্ভবত তাঁর পুণ্যাত্মা পিতা যায়িদের দোয়ার কারণেই তিনি দাওয়াত পাওয়ার সাথে সাথে বিনা বাক্য ব্যয়ে তা কবুল করেন। তখন তার বয়স ছিলো মাত্র বিশ বছর। তিনি তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে খাত্তাবসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। তোমরা শুনলে খুশি হবে যে সাঈদ (রা.)-এর স্ত্রী ফাতিমা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের বোন। আর এই বোন ও ভগ্নীপতিকে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে শাস্তি দিতে গিয়েই ওমর (রা.) ইসলাম কবুল করেন। অর্থাৎ সাঈদ ও তাঁর স্ত্রী ফাতিমার দাওয়াতেই হযরত ওমর (রা.) ইসলাম কবূল করেন।

ইসলাম কবূলের পর কাফের মুশরকদের অত্যাচারে মক্কায় হিজরত করেন। মদীনায় তিনি হযরত রেফায়া ইবন আবদুল মুনযের-এর মেহমান হন। পরে রাসূল (সা.) সাঈদ (রা.) ও হযরত রাফে ইবন মালেক আনসারীর মধ্যে ভাই সম্পর্ক পাতিয়ে দেন।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধ হিসাবে খ্যাত বদরের যুদ্ধ। কোরাইশদের যে বাণিজ্য, কাফেলাকে উপলক্ষে করে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় তারা শাম দেশ থেকে আসছিল। রাসূল (সা.) কোরাইশদের সমস্ত বিষয় অবগত হওয়ার জন্য হযরত তালহা (রা.) ও হযরত সাঈদ ইবন যায়িদকে (রা.) গুপ্তচর হিসাবে পাঠান। তাঁরা শাম দেশের সীমান্তবর্তী তুজবার নামক স্থানে কশদ জোহানীর মেহমান হন। কোরাইশ বাণিজ্য কাফেলা সীমান্ত অতিক্রম করার পর পরই গুপ্তচরদ্বয় দ্রুত মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হন সংবাদটি রাসূল (সা.)-এর নিকট পৌছানোর

www.icsbook.info

জন্য।

কিন্তু কোরাইশ বাণিজ্য কাফেলার লোকেরা বিষয়টি কিছুটা আঁচ করতে পেরে তাদের পথ পবির্তন করে সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরে চলা শুরু করে। এই বাণিজ্য কাফেলা ও মক্কা থেকে আগত তাদের সশস্ত্র সাহায্য কারীরা একত্রিত হয়ে বদর নামক স্থানে মুসলমানদের মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধই ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ নামে খ্যাত। মুসলমানেরা মাত্র ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে ১০০০ জন কোরাইশ সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করে এবং বিজয়ী হয়। এ যুদ্ধে কাফেরদের ৭০ জন নিহত হয় ও ৭০ জন বন্দী হয়। তোমরা শুনে খুশি হবে এ যুদ্ধেই আবূ জেহেল নিহত হয়।

হযরত সাঈদ (রা.) ও হযরত তালহা (রা.) যখন মদীনায় পৌঁছান, তখন বদরের যুদ্ধ শেষ করে মুসলিম গাজীগণ মদীনায় ফিরছিলেন। যদিও এ যুদ্ধে সাঈদ (রা.) সরাসরি অংশ গ্রহণ করেত পারেননি, তবুও যেহেতু এ ব্যাপারেই রাসূল (সা.) তাঁদেরকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাই বদরের যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গণীমতের ভাগও তাঁকে দেওয়া হয়। এমন কি রাসূল (সা.) তাঁকে জেহাদের সওয়াব প্রাপ্ত হওয়ারও সুসংবাদ দেন। বদর যুদ্ধ ছাড়া বাকী সকল যুদ্ধে হযরত সাঈদ (রা.) অংশ গ্রহণ করেন ও বীরত্বের পরিচয় দেন। পারস্যের কিসরা ও রোমের কায়সারের সিংহাসন পদানত করার ব্যাপারে তিনি বিরাট ভূমিকা পালন করেন। তাঁর বীরত্বের কারণেই ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়। ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমান পক্ষে সৈন্য সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ হাজার বা তার কাছাকাছি। অপরদিকে রোমান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল একলক্ষ বিশ হাজার। শত্রুপক্ষের এ বিশাল বাহিনী দেখে মুষ্ঠিমেয় মুসলিম সৈন্যরা যখন হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলো, তখন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবূ উবাইদাহ এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা পেশ করেন। এ বক্তৃতা শুনে মুসলিম বাহিনীর একজন সৈনিক বেরিয়ে এসে আবূ উবাইদাহকে বললেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ মুহূর্তে আমি আমার জীবন কুরবানী করবো।' সাঈদ (রা.) বলেন, 'আমি তাঁর

www.icsbook.info

কথা শুনা মাত্রই দেখতে পেলাম সে তাঁর তরবারি কোষমুক্ত করে আল্লাহর শত্রুদের সাথে সংঘর্ষের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। এ অবস্থায় আমি দ্রুত মাটিতে লাফিয়ে পড়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে অগ্রসর হলাম। এবং আমরা বর্শা হাতে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। শত্রুপক্ষের প্রথম যে ঘোড়সওয়ার আমাদের দিকে এগিয়ে এলো আমি তাকে আঘাত করলাম। তারপর অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তর থেকে সকল প্রকার ভয়ভীতি একেবারেই দূর করে দিলেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী রোমান বাহিনীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালালো এবং তাদেরকে পরাজিত করলো।'

দামেস্ক অভিযানের কথা তো তোমাদের প্রথমেই বলেছি যে, তিনি দামস্কের গভর্নরের পদ ত্যাগ করে যুদ্ধের ময়দানে চলে আসেন। বুঝতেই পারছো তিনি ছিলেন কতবড় যোদ্ধা ও ঈমানদার মানুষ। যিনি কিনা ক্ষমতার মসনদ ত্যাগ করে নিজের জীবনকে তলোয়ারের ছায়ায় পেশ করেছেন।

হযরত সাঈদ (রা.) অত্যন্ত নির্লোভ একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিলো একান্তই সাদা সিধা! আতীক নামক স্থানে তাঁর কিছু জমি ছিলো। এ জমির আয় থেকেই তিনি কোন রকম জীবন যাপন করতেন। কোন ধরনের উচ্চাকাংক্ষা তাকে কখনো স্পর্শ করেনি। তাঁর এই দরিদ্র অবস্থা দেখে শেষ বয়সে হযরত ওসমান (রা.) তাঁকে কিছু জমি দান করেন।

হযরত মোয়াবিয়ার আমলে হযরত সাঈদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে আরওয়া বিনতে উওয়াইস নাম্নী এক মহিলা মদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইবন হাকিমের দরবারে জমি জবর দখলের মামলা দায়ের করে। এ মামলাকে কেন্দ্র করে ঘটে এক শিক্ষণীয় ও মনে রাখার মতো ঘটনা।

আরওয়া নাম্নী ও মহিলা মারওয়ানের দরবারে গিয়ে বলে, 'হযরত সাঈদ ইবন যায়িদ (রা.)-এর জমি সংলগ্ন আমার ব্যক্তিগত কিছু জমি আছে। হযরত সাঈদ তা দখল করে নিয়ে নিজের জমির সাথে যোগ

www.icsbook.info

করেছেন। আমি এর বিচার চাই।'

মারওয়ান বিষয়টি কতটুকু ঠিক তা যাচাই বাছাই করার জন্য লোক নিয়োগ করেন। সাঈদ (রা.)-এর কাছে যখন বিষয়টি পেশ করা হলো তখন তিনি বললেন, 'আপনারা কি মনে করেন আমি তার ওপর যুলুম করেছি? অথচ আমি রাসূল (সা.)-এর নিকট থেকে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি অপরের কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ জমিও যুলুম করে দখল করবে, কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির ঐ রকম সাতগুণ জমির হার তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।' অতপর তিনি বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! যদি এ মহিলাটি নিজের দাবীতে মিথ্যাবাদী হয় তবে সে অন্ধ হয়ে যাক এবং যে কূপ নিয়ে সে আমার সাথে ঝগড়া করছে সে কূপই তার কবর হোক।'

এর কিছুদিন পরেই সত্যিসত্যিই মহিলাটি অন্ধ হয়ে যায় এবং বিতর্কিত কূপে পড়ে সে মারা যায়। ফলে ঘটনাটি কিংবদন্তীর মত মদীনায় ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকেরা অভিশাপ দিতে যেয়ে বলতো, 'আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করুন, যেমন অন্ধ করেছেন আরওয়াকে।

হযরত সাঈদ (রা.) নিজেকে সকল প্রকার ঝগড়া ফাসাদ থেকে হেফাজত করেন। তাই বলে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ছাড়েননি। হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর তিনি প্রায়ই কুফার জামে মসজিদে দাঁড়িয়ে বলতেন, 'তোমরা হযরত ওসমান (রা.)-এর সাথে যে আচরণ করেছো তাতে যদি ওহুদের পাহাড়ও কেঁপে ওঠে, তো আশ্চর্যের কিছুই নেই।

মুগীরা ইবন শো'বা তখন কুফার গভর্নর। কোন একদিন হযরত সাঈদ (রা.)-এর উপস্থিতিতে জামে সমজিদে একজন কুফাবাসী মুগীরার দিকে মুখ করে হযরত আলীকে গালি দিতে থাকে। সাঈদ (রা.) এহেন পরিস্থিতিতে বলে ওঠেন, 'মুগীরা, হে মুগীরা! রাসূল (সা.)-এর সাহাবীদের আপনার সামনে গালি দেওয়া হবে, আর আপনি তার প্রতিবাদ করবেন না, এ দেখতে চাই না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আবূ বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা,

www.icsbook.info

যুবাইর, আবদুর রহমান, সা'দ (রা.) এরা সবাই জান্নাতী। আর যদি তোমরা চাও তো আমি দশম জান্নাতী ব্যক্তির নাম বলতে পারি।' অতপর জনতার অনুরোধে তিনি বললেন, 'দশম ব্যক্তি আমি নিজে।'

হিজরী পঞ্চাশ সনে আশারায়ে মোবাশ্‌শারার এ সম্মানিত সদস্য সত্তর বছর বয়সে আকীক উপত্যকায় নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন। হযরত সা'দ ইবন আবীওয়াক্কাস তাঁর গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করেন এবং আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

এরপর মদীনায় এনে তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত সাঈদ (রা.)-এর জীবনী খুব বেশী জানা যায়নি। এ বুজুর্গ সাহাবা যুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকতেন রাসূল (সা.)-এর আগে এবং নামাযে থাকতেন পেছনে।

সমাপ্ত

www.icsbook.info

সুহৃদের বই হোক আপনার অবসরের সঙ্গী

ফ্লাইং সসার সিরিজ (রহস্য উপন্যাস)

- বঙ্গসেনার কবলে/নাসির হেলাল/৩০.০০
- অপারেশন কাশ্মীর/নাসির হেলাল/৩০.০০
- গ্রোজনীতে শ্বেত ভল্লুক/নাসির হেলাল/৩০.০০
- বসনিয়ায় রক্তনদী/নাসির হেলাল/৩০.০০
- মৃত্যুপুরী/নাসির হেলাল/৩০.০০
- পার্বত্য হায়েনা/নাসির হেলাল/৩০.০০
- মরণ কামড়/নাসির হেলাল/৩০.০০
- নাফ নদীতে রক্তস্রোত/নাসির হেলাল/৩০.০০
- হুমকি/জুবায়ের হুসাইন/৩০.০০

জীবনী

- মরু দুলাল/গোলাম মোস্তফা/৮০.০০
- মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা/নাসির হেলাল/৩৫.০০
- বেহেশতের সুসংবাদ পেলেন যাঁরা/নাসির হেলাল/৫০.০০
- মু'মীনদের মা/নাসির হেলাল/৫০.০০
- নবী দুলালী/নাসির হেলাল/৫০.০০
- আহলে বাইত বা বিশ্বনবীর পরিবার/নাসির হেলাল/১০০.০০
- সেরা মুসলিম মনীষীদের জীবন কথা (১ম খণ্ড) নাসির হেলাল/৬০.০০
- জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা/নাসির হেলাল/৮০.০০
- নবী-রাসূলদের জীবন কথা (১ম খণ্ড)/নাসির হেলাল/১০০.০০
- ফুলের মত নবী (সা.)/নাসির হেলাল/৫০.০০

কিশোর জীবনী

- ছোটদের হযরত আদম (আ.)/নাসির হেলাল/৪০.০০
- ছোটদের খাদিজা ও আয়েশা (রা.)/নাসির হেলাল/৪০.০০
- ছোটদের হযরত ফাতিমা (রা.)/নাসির হেলাল/৪০.০০
- ছোটদের চার খলিফা/নাসির হেলাল/৪০.০০
- ছোটদের নবী কাহিনী/কবি গোলাম মোস্তফা/৪০.০০

সমগ্র/রচনাবলী

- গোলাম মোস্তফা সমগ্র, ১ম খণ্ড/২০০.০০
- গোলাম মোস্তফা সমগ্র, ২য় খণ্ড/২০০.০০
- মুন্সী মেহেরউল্লা রচনাবলী (১ম খণ্ড)/১৫০.০০
- মুন্সী মেহেরউল্লা রচনাবলী (২য় খণ্ড)/১৫০.০০

সুহৃদ প্রকাশন